وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-45

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

বাৎসরিক সাব্‌সক্রিপশন ৬০০ টাকা

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 5 Nov, 2026 — 24 জামাদিউল আওয়াল 1448 A.H

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

দরূদ শরীফ পাঠ করার আদেশ

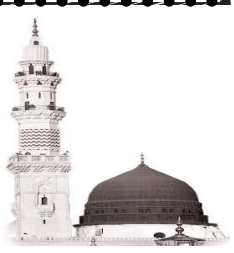
إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

[সূরা আহযাব: ৫৭]

মহানবী (সা.)-এর বাণী

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য দরূদ শরীফ আবশ্যক



عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ". قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ". قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، وَأَبُو هَانِئٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْجَنْبِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ.

হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ বর্ণনা করেন:আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এলেন এবং নামাজ আদায় করলেন। এরপর দোয়া করতে গিয়ে বললেন,

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো।"

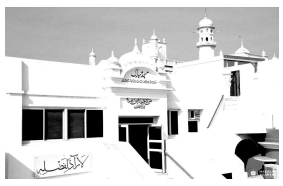
মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হে নামাজ আদায়কারী! তুমি তাড়াহুড়ো করেছ। তুমি যখন নামাজ আদায় করে বসবে, তখন আল্লাহতালার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করবে, তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। এরপর নিজের ইচ্ছামতো যে দোয়া করতে চাও, তা করবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি এলেন। তিনি আল্লাহতালার প্রশংসা বর্ণনা করলেন এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করলেন। তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: اَيُّهَا الْمُصَلِّي اُدْعُ تُجَبْ

"হে নামাজ আদায়কারী! দোয়া করো, তোমার দোয়া কবুল করা হবে।"

- সুনান আত-তিরমিযি, দোয়াসমূহের অধ্যায়, হাদিস নং ৩৪৭৬।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী



হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন পবিত্র ও পরিশুদ্ধ। তিনি জান্নাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম।

হযরত আকদাস মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেন:

"আমরা বিশ্বাস করি যে, ইয়াজিদ ছিল অপবিত্র স্বভাবের, পৃথিবীর কীট এবং অত্যাচারী। আর যে অর্থে কাউকে মুমিন বলা হয়, সেই অর্থগুলো তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। মুমিন হওয়া কোনো সহজ বিষয় নয়। আল্লাহতালা এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলেন:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

[অনুবাদ: মরুবাসীরা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি।" তুমি বলো, "তোমরা ঈমান আনোনি; বরং বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।]"'

(সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫)

মুমিন তারাই, যাদের হৃদয়ে ঈমান লিখে দেওয়া হয় এবং যারা নিজেদের স্রষ্টা ও তাঁর সন্তুষ্টিকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়। যারা আল্লাহর জন্য তাকওয়ার সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ পথগুলো অবলম্বন করে এবং তাঁর ভালোবাসায় নিমগ্ন হয়ে যায়। আর যেসব বিষয় মূর্তির মতো আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে-তা নৈতিক অবস্থা হোক, পাপাচারপূর্ণ কাজ হোক কিংবা উদাসীনতা ও অলসতা হোক-তারা এসব কিছু থেকে নিজেদের সর্বাধিক দূরে সরিয়ে রাখে।

কিন্তু হতভাগ্য ইয়াজিদের এসব গুণ কোথায় ছিল? পার্থিব জগতের প্রতি ভালোবাসা তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে, হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন পবিত্র ও পরিশুদ্ধ। নিঃসন্দেহে তিনি সেই মনোনীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের আল্লাহতালা নিজ হাতে পরিশুদ্ধ করেন এবং নিজের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি জান্নাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর প্রতি সামান্যতম বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমান হারানোর কারণ। আর এই ইমামের তাকওয়া, আল্লাহতালার প্রতি ভালোবাসা, ধৈর্য, অবিচলতা, জগতবিমুখতা ও ইবাদত আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।" - মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৪৮-৫৫০, ইশতেহার নং ২৬৩, প্রকাশনা: আশ-শিরকাতুল ইসলামিয়া, রাবওয়া।

তফসীরে কবীর

খোদা তাআলা ইমাম হোসেনের প্রতিশোধ নিয়েছেন

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে জানা যায় যে, কারবালার ঘটনার পর আল্লাহতালা হযরত ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারীদের নিজ শাস্তির আওতায় নিয়ে আসেন এবং তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাভ করে। তবে আল্লাহতালার প্রতিশোধ গ্রহণের একটি পদ্ধতি এও যে, অত্যাচারীর সন্তানসন্ততি নিজেদের পিতা-পিতামহের অত্যাচার ও ভুলত্রুটি স্বীকার করে এবং তাঁদের উত্তরাধিকারী হতে অস্বীকার করে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তাঁর 'খিলাফতে রাশেদা' গ্রন্থে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর সংঘটিত এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন যে-

"ইয়াজিদের মৃত্যুর পর যখন তার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করল, যার নামও তার পিতামহের নাম অনুসারে মুয়াবিয়া ছিল, তখন লোকদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার পর সে নিজের বাড়িতে চলে গেল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাইরে বের হলো না। এরপর একদিন সে বাইরে এল এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের বলল, 'আমি তোমাদের কাছ থেকে আমার হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি। কিন্তু এ কারণে নয় যে, আমি নিজেকে তোমাদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের যোগ্য মনে করি; বরং এ কারণে যে, আমি চেয়েছিলাম, তোমাদের মধ্যে যেন বিভেদ সৃষ্টি না হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি ঘরে বসে এ কথাই চিন্তা করে আসছি যে, তোমাদের মধ্যে যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকেন, যিনি লোকদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের যোগ্য, তাহলে আমি এই নেতৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করব। কিন্তু অনেক চিন্তাভাবনা করেও তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি খুঁজে পাইনি। সুতরাং, হে লোকেরা! তোমরা ভালোভাবে শুনে রাখো, আমি এই পদের যোগ্য নই। আর এ কথাও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমার পিতা এবং আমার পিতামহও এই পদের যোগ্য ছিলেন না। আমার পিতা মর্যাদার দিক থেকে হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের ছিলেন। আর

১২ পাতার শেষাংশ....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সম্পাদকীয়

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আ.)-এর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা ২০২৬-এর দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ন অধিবেশনে ভাষণের সারসংক্ষেপ

জার্মানির বার্ষিক জলসা ২০২৬ উপলক্ষে আমিরুল মুমিনিন হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয)-এর মহিলাদের উদ্দেশে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ভাষণের সারসংক্ষেপ

তাশাহহুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয) বলেন, আপনারা আজ বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করার জন্য সমবেত হয়েছেন। জামাতের ওপর আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি জামাতের নারীদের মধ্যে এমন অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁদের বারবার এদিকে মনোযোগী করে যে, আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, যাতে আমরা নিজেরাও এবং আমাদের বংশধররাও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভকারী হতে পারি। বর্তমান সময়ে যখন পৃথিবী অত্যধিকভাবে খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন হয়ে পড়ছে এবং আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছে, তখন আমরা যেন ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার অঙ্গীকার অনুসারে চলি। এ যুগে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, চারদিক থেকে দাজ্জালের আক্রমণ আহমদীদেরও কমবেশি প্রভাবিত করেছে। আর কিছু আহমদী নারীও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নন। বিশেষত, যেসব দেশে শিক্ষা ও উন্নতির নামে শয়তান মানুষকে প্রভাবিত করছে, সেখানে এ বিষয়টি আরও বেশি লক্ষণীয়।

ইসলাম উচ্চশিক্ষা অর্জনে বাধা দেয় না; বরং এর প্রতি উৎসাহিত করে। ইসলাম উন্নতি করা এবং পৃথিবীর নিয়ামতসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার পথে বাধা দেয় না; বরং এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু একই সঙ্গে ইসলাম এ কথাও বলে যে, নিজেদের কর্তব্যসমূহও পালন করতে হবে।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন, ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং মর্যাদার দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা জ্ঞানসম্পন্নও ছিলেন। বরং তাঁদের বর্ণনাসমূহ প্রায়ই ফকীহদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। কিন্তু তাঁদের এ বিষয়টিও জানা ছিল যে, নারীর দায়িত্ব কী এবং পরিবার ও সমাজে নিজেদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের কী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাঁরা নিজেদের অধিকার আদায় করার পরিবর্তে অন্যের অধিকার প্রদান এবং কর্তব্য পালন করার কথা বলতেন। এ কারণেই ইসলামের ইতিহাসে তাঁদের নাম অত্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে।

আজ আহমদী নারীদের সামনে এ বিষয়টি রাখতে হবে যে, তাঁরা কীভাবে এসব দায়িত্ব পালন করবেন। পরিবার, সমাজ, সন্তানসন্ততি ও পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে নিজেদের আদর্শ উপস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়েও চিন্তাভাবনা করতে হবে যে, তাঁদের দৃষ্টিতে অথবা বাস্তবেই যদি পুরুষেরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে থাকেন, তাহলে তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও ধর্মপরায়ণ পুরুষ এবং নারী গড়ে তুলতে হবে, যাতে হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে যে বাইআতের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা পালন করে আমরা একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এ জন্য হযরত মসীহে মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কী চান, তা উপলব্ধি করতে হবে।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন, এ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে উন্নতির নামে অনেক কিছু বলা হচ্ছে; কিন্তু একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে। হযরত মসীহে মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কী চান, তা দেখতে হবে। তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলো সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। আর তা তখনই সম্ভব, যখন সেগুলো সামনে রেখে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হবে। অন্যথায় আহমদী হওয়ার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না।

হযরত মসীহে মওউদ (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এ কথা স্মরণ রেখো যে, যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, অথচ তাদের আমল সঠিক নয়, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদের পছন্দ করেন না। নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য স্মরণ রেখো, যেখানে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং তাঁর ইবাদতের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হবে, সেখানে অন্যদের অধিকার আদায়ের বিষয়টিও মনে রাখতে হবে। প্রত্যেক সৎকর্মশীল ব্যক্তির সঙ্গে সৎ আচরণ করতে হবে। উচ্চ নৈতিকতা বলতে শুধু সৎকর্মশীল ব্যক্তির সঙ্গে সৎ আচরণ করাকে বোঝায় না; বরং মন্দ আচরণকারী ব্যক্তির সঙ্গেও সৎ আচরণ করতে হবে। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ মান সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সত্যিকার চেতনা সৃষ্টি হতে পারে না, যার জন্য এ জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতএব, সর্বদা স্মরণ রাখবেন, যেখানে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, সেখানে তাঁর বান্দাদের অধিকারও আদায় করতে হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি দূর করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একে অপরকে ক্ষমা করার অনুভূতি সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও নারীর স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁদের শান্তি ও মীমাংসার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এ ভিত্তি নিজেদের ঘর থেকেই শুরু হয়। এর মাধ্যমেই পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষা লাভ করবে এবং তারাও নিজেদের পরিবেশে ভালোবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হবে।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন, এরপর হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেছেন, জামাতের সদস্যদের পারস্পরিক ঐক্য ও ভালোবাসার সঙ্গে বসবাস করা উচিত। তিনি বলেছেন, আমি মাত্র দুটি বিষয় নিয়ে এসেছি। একটি হলো, আল্লাহকে মানো; দ্বিতীয়টি হলো, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করো। সাহাবিদের মধ্যেও এভাবেই বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল। তোমাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হতে হবে যে, নিজের জন্য যা পছন্দ করো, নিজের ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে। অন্যথায় সে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও সতর্ককারী একটি বাক্য। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর চিন্তা করা উচিত যে, তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে এবং বাইআতের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হলে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করা অপরিহার্য। তিনি বলেছেন, মাহদির একটি নিদর্শন এও যে, মানুষের অন্তর থেকে বিদ্বেষ ও হিংসা দূর হয়ে যাবে। এখন যখন আমরা মসীহ (আ.) ও মাহদি (আ.)-কে মেনে নিয়েছি, তখন চিন্তা করতে হবে যে, আমরা যদি পরস্পরের প্রতি অন্তর থেকে বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করি, তাহলেই বাইআতের অধিকার আদায়কারী হতে পারব।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন, এরপর হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেছেন, পৃথিবীকে নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ো না; বরং ধর্মকে নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানাও। আপনারা এসব দেশে এসেছেন এবং আল্লাহ আপনাদের আর্থিক সচ্ছলতাও দান করেছেন। পাকিস্তানে আপনাদের যে পরিস্থিতি ছিল অথবা যেসব স্থান থেকে আপনারা হিজরত করে এসেছেন, সেখানকার তুলনায় এখানে পরিস্থিতি অনেক ভালো। কিন্তু যদি ধর্ম আপনাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য না হয়ে পার্থিব জীবনই চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তাহলে এখানে আসার কোনো লাভ নেই। কারণ, আপনাদের অধিকাংশই এ উদ্দেশ্যেই এসেছেন যে, অন্যান্য দেশে, বিশেষত পাকিস্তানে, আপনাদের ধর্মের ওপর যথাযথভাবে আমল করার অনুমতি দেওয়া হতো না। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মকে অগ্রাধিকার দিন। এমন যেন না হয় যে, সম্পদ ও অর্থপ্রাপ্তির পর ধর্মকে ভুলে যাবেন। ধর্মই যেন আপনাদের সামনে থাকে-এটিই একজন আহমদীর পরিচয়।

এরপর হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেছেন, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসায় এতটা নিমগ্ন হয়ো না, যাতে তোমাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে পর্দা সৃষ্টি হয়ে যায়। সন্তানসন্ততিও পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে। নারীরাও কখনো কখনো সন্তানদের কারণে ঝগড়াবিবাদে জড়িয়ে পড়েন। শাশুড়ি ও পুত্রবধূর ঝগড়ার ক্ষেত্রেও নারীদের ভূমিকা থাকে। তিনি বলেছেন, একজন আহমদী মুসলমান হওয়ার পর তোমাদের এসব ঝগড়াবিবাদ দূর করতে হবে। যখন তোমরা তা করবে, তখন সেই দায়িত্বের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করবে, যে উদ্দেশ্যে হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর হাতে বাইআত করেছ।

তিনি বলেছেন, এ কথা মনে করো না যে, এই পৃথিবীই সবকিছু। মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন এবং জবাবদিহি গ্রহণ করবেন; অন্যায় কাজের শাস্তিও প্রদান করবেন। এ পৃথিবী ও পরকাল-উভয় জগতের কল্যাণের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করো। এরপর তিনি বলেছেন, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং আল্লাহর নির্দেশনার ওপর আমল করার জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করো। এর ফলে শুধু তোমাদের নিজেদের অবস্থারই উন্নতি হবে না; বরং তবলীগের ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হবে।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয) বলেন, অতএব, এসব কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। নারীদেরও তবলীগের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা উচিত।

বর্তমান বিশ্বের এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে পৃথিবী জানতে পারে যে, তাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় আল্লাহ তা'আলার দিকে নত হওয়ার মধ্যে নিহিত, পার্থিব জাঁকজমক ও আড়ম্বরের মধ্যে নয়।

তিনি বলেন, এ ধারণা পোষণ করো না যে, বাইআত গ্রহণ করলেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যান। এটি তো কেবল বাহ্যিক আবরণ; এর প্রকৃত নির্যাস রয়েছে এর অভ্যন্তরে। আর সেই নির্যাস হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করা। কুরআন করিম অধ্যয়ন না করা পর্যন্ত এবং তা পড়ে বোঝার চেষ্টা না করা পর্যন্ত এ আমল সম্ভব নয়। কুরআন পড়ে তার ওপর আমল করা শুধু

শেষাংশ ৭ পাতায়....



জুমআর খুতবা

মহানবী (সাঃ)-এর খোদা-নির্ভরতা

মহানবী (সা.)-এর অসাধারণ সাহসিকতার দিকে লক্ষ্য করুন। শত্রু মাথার ওপর এসে উপস্থিত, অথচ তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী সিদ্দীক (রা.)-কে বলছেন, 'দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

এই শব্দগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি (সা.) মুখে উচ্চারণ করেই কথাগুলো বলেছিলেন, কারণ এ ক্ষেত্রে আওয়াজের প্রয়োজন ছিল। ইশারার মাধ্যমে কাজ চলত না। বাইরে শত্রুরা পরামর্শ করছিল এবং গুহার ভেতরে খাদেম ও তাঁর প্রভুও কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন। শত্রুরা তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনে ফেলতে পারে-এমন আশঙ্কার কোনো পরোয়া করা হয়নি। এটি মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং তাঁর পরিচিতি লাভের এক উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লাহতাআলার প্রতিশ্রুতির ওপর ছিল পরিপূর্ণ আস্থা। [হজরত মসীহ মওউদ (আ.)]

"মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা তাঁর সঙ্গীর ওপরও এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁর মুখ থেকেও এ কথা বের হয়নি যে, আমরা ধরা পড়ে গেছি। বরং তিনি শুধু এতটুকুই বলেছিলেন যে, শত্রু এতটা কাছে চলে এসেছে যে, তারা যদি আমাদের দেখতে চায়, তবে আমাদের দেখতে পাবে।

কিন্তু মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.) এই আশঙ্কাটুকুও বরদাশত করেননি। তিনি বললেন, এমন ধারণাও করো না। আমরা এখন দুজন নই; আমাদের সঙ্গে আরও একটি সত্তা রয়েছেন, আর তিনি হলেন আমাদের প্রভু আল্লাহ।" (হজরত মুস্‌লেহ মওউদ (রা.))

"রাসুলে করিম (সা.)-এর আল্লাহতাআলার ওপর এমন নির্ভরশীলতা ছিল যে, প্রতিটি বিপদ ও সংকটের সময় তিনি কেবল তাঁরই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতেন।" [হজরত মুস্‌লেহ মওউদ (রা.)]

আল্লাহতাআলার ওপর মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা প্রতিদিন এক নতুন মহিমায় প্রকাশিত হতো।

তিনি (সা.) বলতেন, যদি তারা সূর্যকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে আমার সামনে দাঁড় করিয়েও দেয়, আর চাঁদকেও তার অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে আমার সামনে উপস্থিত করে, তবুও আল্লাহতাআলার সত্তার প্রতি আমার এমন বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, আমি এসবকে কেবল জাদুকরী কৌশল বলে মনে করব। আমি তাদের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সর্বদা আপত্তি জানাব এবং নিজের কাজ থেকে কখনো বিরত হব না। আল্লাহতাআলার সত্তার প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার এমন এক স্তর, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখা যায় না।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১১ তাবুক, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ওপর মহানবী (সা.)-এর 'তাওয়াক্কুল' (খোদানির্ভরতা) সংক্রান্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় গত জুমুআয় বর্ণনা করেছিলাম। আজও এই একই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

মুমিনদেরকে তাওয়াক্কুলের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) যা বলেছেন, তা হযরত আবূ দরদা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সাত বার এই দোয়া পাঠ করবে- حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ আল্লাহ্-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের প্রভু -তবে আল্লাহ্ তার সেইসব উদ্বেগের বিষয় থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে চিন্তিত করে; সে এতে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী ।

[সুনান আবু দাউদ , কিতাবুল আদাব, হাদীস-৫০৮১]

মহানবী (সা.) নিজের জন্য তাওয়াক্কুলের (খোদানীর্ভরতার) বিষয়ে কীভাবে দোয়া করতেন, সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে আছে-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি (সা.) যখন রুকূতে যেতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ

وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্যই রুকূ করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, নিজের সত্ত্বাকে তোমার কাছেই সঁপে দিয়েছি এবং তোমার ওপরই তাওয়াক্কুল করেছি। তুমিই আমার প্রভু। আমার শ্রবণ, দৃষ্টি, রক্ত, মাংস, অস্থি ও স্নায়ু-সবকিছুই সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্র সমীপে অবনত হয়ে পড়েছে।

[সুনান নিসাঈ, কিতাবুত তাতবীক, হাদীস-১০৫১]

এরপর অপর একটি রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন: যখনই আমার কোনো চিন্তা হতো, জিবরাঈল (আ.) আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলতেন-'হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন:'

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ

فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -

[সূরা আল-ইসরা ১৭:১১১] (অর্থ: আমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর তাওয়াক্কুল করলাম, যিনি কখনো মৃত্যু হবে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্?রই জন্য, যিনি কাউকেও পুত্ররূপে গ্রহণ করেননি এবং যাঁর রাজত্বে কোনো শরীক নেই, আর না তাঁর এমন কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন পড়েছে যিনি দুর্বলতার কারণে তাঁর সাহায্যকারী হবেন; এবং আপনি পূর্ণ সমারোহে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।

[আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, কিতাবুদ দুয়া, হাদীস-১৮৭৬]

তাউস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী (সা.) যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠতেন, তখন বলতেন-এটি একটি সুদীর্ঘ দোয়া,

[اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ

السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ،

وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ،

وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا

أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ]

এর অনুবাদ হলো: "হে আল্লাহ্! সর্বপ্রকার প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমি সর্গমত্যের এবং এগুলোর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোকে স্থায়িত্ব ও স্থিতিদাতা। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, সর্গমত্যের এবং এদের মধ্যে বিরাজমান সবকিছুর রাজত্ব তোমারই। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সবকিছুর নূর। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমি সর্গমত্যের এবং এগুলোতে বিরাজমান সবকিছুর বাদশাহ্। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমিই সত্য (হক), তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাৎ সুনিশ্চিত, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, সকল নবী সত্য, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-ও সত্য এবং কিয়ামতের ক্ষণটিও সত্য। হে আল্লাহ্! আমি তোমারই সমীপে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমার ওপরই নীর্ভর করেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমারই খাতিরে এই বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছি আর তোমারই শক্তিতে বিরোধীদের মোকাবিলা করেছি আর তোমার দরবারেই সিদ্ধান্ত চেয়েছি। অতএব তুমি আমার পূর্বাপর সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দাও এবং তা-ও ক্ষমা করো যা আমি গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।" অথবা তিনি (সা.) বলতেন: '***লা-ইলাহা ইল্লা গায়রুকা***' অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। [সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, হাদীস-১১২০]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন: "হে আল্লাহ্! আমি তোমারই আনুগত্য স্বীকার করি, তোমার ওপর ঈমান আনি, তোমার ওপর তাওয়াক্কুল করি এবং তোমার দিকেই ধাবিত হই। তোমার সাহায্যেই আমি মোকাবিলা করি। হে আল্লাহ্! আমি এই বিষয় থেকে তোমার মর্যাদার আশ্রয়ে আসছি যে তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করবে। তুমি ছাড়া কোনো

উপাস্য নেই। তুমিই সেই চিরঞ্জীব, যাঁর কখনো মৃত্যু ঘটবে না; অথচ জিন ও ইনসান সবাই মৃত্যুবরণ করবে।"

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুয়া ওয়াত তওবা ওয়াল ইসতিফার]

মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি সর্বদাই আল্লাহ্ তা'লার ওপর নিবদ্ধ থাকতো। তাঁর এই গুণের সর্বোচ্চ মান উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মাউদ (রা.) এক জায়গায় লিখেছেন, বরং তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল করীম (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার ওপর এমন ভরসা ছিল যে, যেকোনো বিপদ ও কঠিন মুহূর্তে তিনি কেবল তাঁর প্রতিই দৃষ্টি রাখতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি বর্তমানকালের সুফিদের মতো উপায়-উপকরণ (আসবাব) বর্জনকারী ছিলেন না-অর্থাৎ বর্তমানের সুফিরা যেমন বলে থাকে, উপকরণের প্রয়োজন নেই, কেবল তাওয়াক্কুলই যথেষ্ট। তিনি উপকরণ ব্যবহার করতেন; কারণ উপকরণ বর্জন করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অবমাননা করা এবং তাঁর সৃষ্টিকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করার শামিল। কিন্তু সব উপকরণ গ্রহণ করার পর তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ্ তা'লার ওপরই ভরসা করতেন। যদিও তিনি উপকরণ প্রস্তুত করতেন, কিন্তু সেগুলোর ওপর কখনো নির্ভর বা তাওয়াক্কুল করতেন না, বরং কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রত্যাশী থাকতেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তিনি (সা.) যেকোনো উৎকণ্ঠার সময় বলতেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহান আরশের প্রভু; আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি আকাশসমূহের প্রভু, পৃথিবীর প্রভু এবং সম্মানিত আরশের প্রভু। [আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৬]

অর্থাৎ আমার ভরসা ও তাওয়াক্কুল কেবল আল্লাহ্ তা'লার ওপরই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

অর্থাৎ আল্লাহ্-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক! -এটি হযরত ইব্রাহীম (আ.) তখন বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল; আর মুহাম্মদ (সা.) এটি বলেছিলেন যখন কাফেররা বলেছিল: "লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিশাল প্রস্তুতি নিয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো।" হাদীসের ব্যাখ্যাদাতাদের (শারীহীন) মতে, এটি উহুদ, হামরাউল আসাদ অথবা পরিখার যুদ্ধের সময় বলেছিলেন। ফলে এই বিষয়টি তাদের ঈমান আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁরা বলেছিলেন: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ আল্লাহ্-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!। বুখারীতে এই হাদীসটি এসেছে।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস-৪৫৬৩]

বিভিন্ন উপলক্ষে মক্কার মুশরিকদের মহানবী (সা.)-এর কাছে নানা প্রস্তাব পেশ করা অর্থাৎ হরেক রকমের প্রলোভন দেখানো, আর নবী করীম (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার ওপর অভূতপূর্ব ভরাসা রেখে তার জবাব দেওয়া-এ ঘটনাগুলো কেমন ছিল? এমনই একটি সুযোগের কথা ইবনে এসহাক উল্লেখ করেছেন যে, একদিন কুরাইশ সরদার উৎবা বিন রবীআ কুরাইশদের এক মজলিসে বসে ছিল, আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) একা মসজিদে হারামে উপস্থিত ছিলেন।

উৎবা বলল, "হে কুরাইশ! আমি কি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলব না? আমি তাঁর সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করবো, হয়তো তিনি সেগুলোর মধ্য থেকে কোনোটি গ্রহণ করে নেবেন। আমরা তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেব আর তিনি আমাদের বিরুদ্ধে নিজের এই প্রচারণা থেকে ক্ষান্ত হবেন।" এটি তখনকার ঘটনা যখন হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন এবং কুরাইশরা দেখতে পাচ্ছিল যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন কুরাইশরা বলল, "অবশ্যই হে আবুল ওয়ালীদ! আপনিই তাঁর সাথে কথা বলুন।"

সুতরাং উৎবা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এলো, তাঁর কাছে বসে বলল, "হে ভাতিজা! তুমি ভালো করেই জানো যে নিজের বংশে তোমার স্থান ও মর্যাদা অনেক উঁচু, তুমি বংশমর্যাদার দিক থেকেও সম্মানিত; কিন্তু তুমি তোমার জাতির সামনে এমন এক বিরাট বিষয় নিয়ে এসেছ যা তাদের ঐক্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তাদের বুদ্ধিমত্তাকে তুচ্ছ আখ্যায়িত করেছ। তাদের উপাস্য ও ধর্মকে মন্দ বলেছে এবং তাদের অতীতের পিতৃপুরুষদের কাফের সাব্যস্ত করেছ। এখন আমার কয়েকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি তোমার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি, হয়তো তুমি সেগুলোর কোনো একটি গ্রহণ করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "বলুন আবুল ওয়ালীদ, আমি শুনছি।" উৎবা বলল, "ভাতিজা! এই প্রচারের মাধ্যমে যদি তোমার উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা আমাদের সম্পদ একত্রিত করে তোমাকে এতো বেশি দেব যে তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হয়ে যাবে। যদি তুমি সম্মান ও নেতৃত্ব চাও, তবে আমরা তোমাকে আমাদের সরদার বানিয়ে নেব; এরপর তোমার পরামর্শ ছাড়া আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব না। যদি তুমি বাদশাহ হতে চাও, তবে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ্ হিসেবে মেনে নেব। আর যদি তোমার ওপর কোনো প্রেতাত্মা বা জিন চেপে বসে থাকে যা তুমি নিজের থেকে দূর করতে পারছ না"-সেকালের মানুষের মাঝে এই কুসংস্কার প্রচলিত ছিল যে হয়তো জিন ভর করেছে-"তবে আমরা সেরা চিকিৎসকদের এনে তোমার চিকিৎসা করাব এবং এতে আমাদের ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করব, যতক্ষণ না তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠো; কারণ কখনো কখনো মানুষের ওপর এমন অবস্থা চেপে বসে যার চিকিৎসা করাতে হয়।" উৎবা তার কথা শেষ করল আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কথা শুনে চলছিলেন। এরপর তিনি (সা.) বললেন, "হে আবুল ওয়ালীদ! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি (সা.) বললেন, " এখন আমার কথা শুনুন।" সে বলল, "অবশ্যই, আমি শুনছি।"

তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্ (ফুসসিলাত)-এর এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- ﴿١﴾ حٰمٓ ﴿٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٥﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ إِلَيْهِ.....

"আমি আল্লাহ্র নামে পাঠ করছি, যিনি পরম করুণাময়, বারবার কৃপাকারী। হামীদ (প্রশংসিত) ও মজীদ (মহিমান্বিত) খোদার গুণাবলী এই সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই কুরআন অসীম করুণাময় ও বারবার কৃপাকারী খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং যে গ্রন্থ অনেক বেশি পঠিত হবে আর তা এমন এক ভাষায় অবতীর্ণ যা নিজের ভাব নিজেই অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে কিন্তু এ কিতাব তাদের উপকারে আসে যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান রাখে পুণ্যবানদের সুসংবাদ দ্বাতা আর পাপাচারীদের সতর্ককারী, তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা শোনার জন্যও প্রস্তুত নয়। আর তারা বলে, তুমি আমাদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছ, তা মানার ব্যাপারে আমাদের অন্তর আবরণে ঢাকা-অর্থাৎ তা আমাদের অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।"

(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্: ১-৭)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতে থাকলেন আর উৎবা নিথর হয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে থাকে। সে তার দুই হাত পেছনে ভর দিয়ে একাগ্রচিত্তে কুরআন শুনছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সাজদাহর আয়াতে পৌঁছালেন, তখন তিনি (সা.) সাজদাহ্ করলেন। এরপর উৎবাকে বললেন, "হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি যা শোনার শুনেছেন। এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। আপনার কথা আমি শুনেছি, আমার কথা আপনি শুনেছেন; এখন আপনিই ঠিক করুন আমি কী সিদ্ধান্ত নেব।"

মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার ওপর যে পূর্ণ বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল ছিল, তা প্রতিদিন এক নিত্যনতুন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতো।

ইতিহাস সাক্ষী যে, তিনি যখন উৎবাকে এই উত্তর দিলেন, উত্তর দেওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সেই আদর্শেই অবিচল থাকেন। তিনি একথা বলেননি যে তিনি বদলে যাবেন; বরং তিনি তাকে বলেছেন যে তুমি নিজেকে বদলাও এবং নিজেই সিদ্ধান্ত নাও, আর তিনি (সা.) আল্লাহ্?র ধর্মের প্রচার ও তবলীগ অব্যাহত রাখলেন।

এরপর কাফেরদের এই পুরো দলটি একসাথে আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল, "আমরা আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম যে আপনি আপনার ভাতিজাকে নিরস্ত করুন, কিন্তু আপনি তাকে থামাননি। হয় আমরা তাকে আমাদের বিষয়ে এমন কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখব, নয়তো তার ও আপনার সাথে লড়াই করব-যতক্ষণ না উভয় পক্ষের একটি ধ্বংস হয়ে যায়।" কুরাইশরা যখন আবু তালিবকে এ কথা বলল, তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "হে আমার ভাতিজা! আমার ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও। যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: Seth Shamshuddin sb., Barisha (Kolkata)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভাবলেন যে তাঁর চাচা হয়তো তাঁর সাহায্য ছেড়ে দেবেন এবং তাঁকে কুরাইশদের হাতে তুলে দেবেন। তিনি (সা.) বললেন, "চাচাজান! খোদার কসম, এরা যদি আমার ডান পাশে সূর্য আর বাম পাশে চাঁদ এনে রেখে দেয়, তবুও আমি আমার দায়িত্ব থেকে বিরত হব না; আমি আমার কাজ চালিয়ে যাব–যতক্ষণ না খোদা একে পূর্ণতা দান করেন অথবা আমি এই প্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়ে যাই।"

এরপর তিনি (সা.) উঠে সেখান থেকে প্রস্থান করতে গেলে আবু তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, "হে আমার ভাতিজা! তোমার যা ইচ্ছা তুমি বলো, খোদার কসম! কোনো মূল্যে আমি তোমাকে কখনো তাদের হাতে সঁপে দেব না।" [আসসীরাতুন নববীয়াহ, লি ইবনে হাশিম, পৃ: ২০০–২০১,২২০]

হযরত মুসলেহ মাউদ (রা.) ঐতিহাসিক ও বাস্তব ঘটনাগুলোর চিত্র তুলে ধরে এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্ তা'লার তওহীদের বিষয়ে মানুষকে নসীহত করতে শুরু করলেন এবং শির্কের খণ্ডন শুরু করলেন, তখন মক্কাবাসীদের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঠেকলো। অবশেষে একদিন তারা আপস করে এক প্রতিনিধিদলের রূপ ধরে রসূল করীম (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের কাছে এলো এবং তাঁকে বলল, "আপনি আমাদের গোত্রীয় সরদার, আমরা আপনাকে গভীরভাবে সম্মান করি এবং আপনার সম্মানের খাতিরেই এতদিন আপনার ভাতিজাকে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন পানি মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে; তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি যাতে আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে তার সাথে শেষ কথা বলেন।"

অতঃপর তারা উৎবা মহানবী (সা.)-এর কাছে যা যা বলেছিল সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করলো–অর্থাৎ উচ্চ বংশের সুন্দর নারীর লোভ, টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের লোভ এবং রাজত্বের লোভ। তারা বলল, "কিন্তু তাকে বলুন সে অন্তত পক্ষে আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলা হতে বিরত থাকে। আমরা তাকে একথা বলছি না যে সে আমাদের মূর্তিদের মেনে নিক; আমরা শুধু বলছি যে আমাদের দেব-দেবীকে যেন মন্দ না বলে। আর সে যদি আমাদের এসব কথার কোনো একটিও না মানে, তবে আপনি তার সাথ ছেড়ে দিন, আমরা নিজেরাই তার ব্যবস্থা করব।"

আবু তালিব অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন, রসূল করীম (সা.)-কে খুব ভালোবাসতেন; তবে তাঁর নিজের নেতৃত্বও তাঁর কাছে খুব প্রিয় ছিল। তিনি রসূল করীম (সা.)-কে ডেকে এনে বললেন, "আজ তোমার কওম আমার কাছে এসেছিল এবং তারা বলছিল: 'হে আবু তালিব! আমরা আপনাকে সম্মান করি এবং আপনার খাতিরেই এ পর্যন্ত আপনার ভাতিজাকে কিছুই বলিনি, কিন্তু বিষয় এখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সে যদি আর কোনো কথা না-ও মানে, তবে তাকে শুধু এটুকু বলে দিন যেন সে আমাদের মূর্তিগুলোকে মন্দ না বলে। আমরা তাকে আমাদের বাদশাহ্ বানাতে প্রস্তুত, যদি ধন-সম্পদ চায় তবে সম্পদ দিতে প্রস্তুত–আরবে তার চেয়ে বেশি বিত্তশালী কেউ থাকবে না, আমরা দিতে প্রস্তুত। যদি কোনো রূপসী স্ত্রী চায়, তবে আমরা সেরা সুন্দরীর সাথে তার বিয়ে দিতে প্রস্তুত। সারকথা, সে যেকোনো দাবি করুক না কেন, আমরা তা মেটাতে প্রস্তুত; সে শুধু আমাদের মূর্তিপ্রতিমাগুলোকে মন্দ বলা ছেড়ে দিক।'"

রসূল করীম (সা.)-এর ওপর আবু তালিবের অনেক অনুগ্রহ ছিল; তিনি শৈশব থেকে অত্যন্ত স্নেহ-মমতায় তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন এবং প্রতিটি দুঃখ-কষ্টে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রসূল করীম (সা.) যখন তাঁর চাচার এই অবস্থা দেখলেন, তখন তাঁর মহানুভবতার কথা মনে পড়ে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে এলে। কিন্তু তিনি (সা.) বললেন, "চাচাজান! আমি তো আপনাকে বলছি না যে আপনি আমাকে সাহায্য করুন; আপনি নির্দ্বিধায় নিজের গোত্রের সাথে থাকুন এবং আমাকে ছেড়ে দিন। খোদার কসম! এরা যদি সূর্যকে আমার ডান পাশে আর চাঁদকে আমার বাম পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, তবুও আমি এক খোদার জিকির থেকে বিরত হবো না।"

দেখুন, খোদা তা'লার সত্তায় কতখানি আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল! যদিও সূর্য তার নিজ স্থান থেকে সরে যাওয়া এতো বড় অলৌকিক ঘটনা যে তা ঘটলে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাবে; কিন্তু তিনি (সা.) বলেন: এরা যদি সূর্যকে নিজ স্থান থেকে সরিয়ে আমার সামনে এনে দাঁড় করায়, এরা যদি চাঁদকে নিজ স্থান থেকে সরিয়ে আমার সামনে এনে দাঁড় করায়, তবুও খোদা তা'লার সত্তার ওপর আমার এমন বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে যে আমি এসব অলৌকিক ঘটনাকে কেবল ভেলকিবাজি মনে করব এবং তাদের মূর্তি পূজার প্রতিবাদ সর্বদাই করে যাব ও নিজের কাজ থেকে কখনো বিরত হবো না।

[আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ১০৫,১০৬]

এটি আল্লাহ্ তা'লার সত্তার ওপর ঈমান ও পূর্ণ তাওয়াক্কুলের এমন এক পর্যায় যা আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই ঘটনার উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন যে:

"যখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো যে মুশরিকরা অপবিত্র, নোংরা নিকৃষ্টতম জীব, নির্বোধ এবং শয়তানের বংশধর , তাদের উপাসগুলো হলো আগুনের জ্বালানি এবং জাহান্নামের ইন্ধন–তখন আবু তালিব মহানবী (সা.)-কে ডেকে বললেন: 'হে আমার ভাতিজা! এখন তোমার গালিগালাজের (কাফেরদের মতে মন্দ ভাষার) কারণে কওম দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং তারা অচিরেই তোমাকে হত্যা করবে এবং আমারও প্রাণ নেবে। তুমি তাদের বিজ্ঞজনদের নির্বোধ বলেছ, মুরুব্বীদের সৃষ্টির নিকৃষ্টতম বলেছ, আর তাদের শ্রদ্ধেয় উপাস্যদের নাম রেখেছ 'জাহান্নামের খড়ি' ও 'আগুনের ইন্ধন', আর মোটের ওপর তাদের সবাইকে অপবিত্র ও শয়তানের বংশধর সাব্যস্ত করেছ। আমি তোমার কল্যাণকামী হিসেবে বলছি, তুমি তোমার মুখ সামলাও এবং এ জাতীয় কথাবার্তা থেকে বিরত হও, অন্যথায় কওমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সামর্থ্য আমার নেই।'

মহানবী (সা.) জবাবে বললেন: 'হে চাচা! এটি গালি দেওয়া নয়; বরং এটি শুধু বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ এবং ঘটনাকে যথাযথ স্থানে উপস্থাপন করা মাত্র। আর এটিই তো সেই কাজ যার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি এতে আমার মৃত্যুও নির্ধারিত থাকে, তবে আমি আনন্দের সাথে নিজের জন্য এই মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার জীবন তো এই পথেই ওয়াক্ফ উৎসর্গীকৃত। আমি মৃত্যুর ভয়ে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে পারি না। আর হে চাচা! আপনি যদি নিজের দুর্বলতা ও কষ্টের কথা ভাবেন, তবে আমাকে আশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। খোদার কসম! আপনার কোনো সাহায্যের মুখাপেক্ষী আমি নই। আমি ঐশী নির্দেশাবলী পৌঁছানো থেকে কখনো ক্ষান্ত হব না। আমার কাছে আমার মওলার আদেশ জানের চেয়েও প্রিয়। খোদার কসম! আমি যদি এই পথে নিহতও হই, তবে চাইব যেন বারবার জীবিত হয়ে সর্বদা এই পথেই প্রাণ বিসর্জন দিই। এটি ভয়ের বিষয় নয়; বরং তাঁর পথে কষ্ট ভোগ করার মাঝে আমি অপার আনন্দ লাভ করি।'

মহানবী (সা.) এই বক্তব্য রাখছিলেন, আর তাঁর পবিত্র চেহারায় সত্যতা ও নূরানিয়্যাতে ভরা এক আবেগদীপ্ত ভাব ফুটে উঠছিল। মহানবী (সা.) এই বক্তব্য শেষ করলে সত্যের আলো দেখে অবলিলায় আবু তালিবের অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি বললেন: 'আমি তোমার এই সুউচ্চ অবস্থা সম্পর্কে বেখবর ছিলাম! তুমি তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রঙে ও ভিন্ন মহিমায় বিরাজমান! যাও, নিজের কাজে লেগে থাকো; আমি যতদিন বেঁচে আছি এবং আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে, আমি তোমার সঙ্গ দিব।" [ইজালায়ে আওহাম, প্রথম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০-১১১]

একইভাবে তায়েফ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুলের(খোদানীর্ভরতার) এক অপরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তিনি একা তায়েফের সরদারদের তবলীগ করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, যারা অত্যাচারের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। ফেরার পথে বাহ্যতঃ মক্কায় প্রবেশের কোনো পরিস্থিতি ছিল না। সাথে একজন খাদেম ছিলেন, আর সেই খাদেম চিন্তিত ছিলেন যে এখন কী হবে! কিন্তু তাঁর (সা.) নিজের প্রভুর ওপর পূর্ণ ভরসা ছিল।

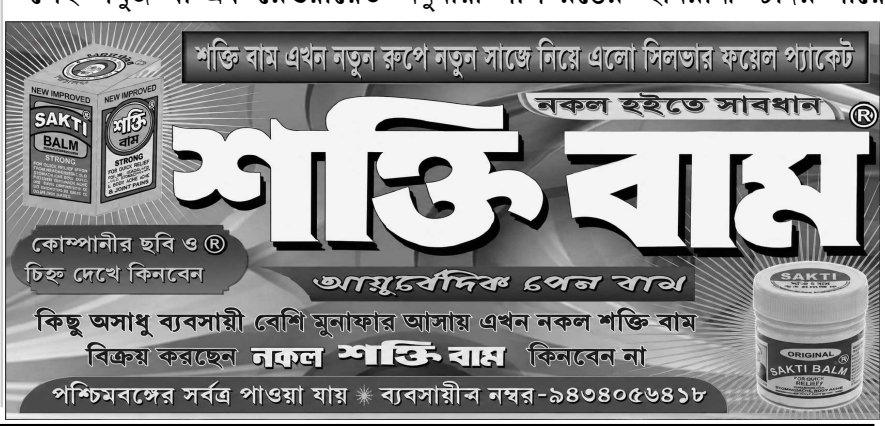
যেমনটি উল্লেখ করে সেই খাদেম হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আমি তাঁর (সা.) সকাসে নিবেদন করলাম, "ইয়া রসূলুল্লাহ্! এখন আপনি কীভাবে মক্কায় প্রবেশ করবেন কেননা তারা যে আপনাকে বের করে দিয়েছে?"

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কতই না ঈর্ষণীয় তাওয়াক্কুলের শানে জবাব দিলেন, "হে যায়েদ! তুমি দেখবে, আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়ই কোনো পথ বের করবেন; আর আল্লাহ্ তা'লা নিজের ধর্মের সাহায্যকারী, তিনি তাঁর নবীকে বিজয়ী করে ছাড়বেন।"

সুতরাং নবী করীম (সা.) কুরাইশ সরদারদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে তারা যেন তাঁকে আশ্রয়ে নিয়ে মক্কায় প্রবেশের ব্যবস্থা করে। সব সরদারই অস্বীকার করল; অবশেষে একজন মহৎ সরদার মুতইম বিন আদী তাঁকে নিজের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করানোর ঘোষণা দিল।

[আত্তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫]

হিজরতে নববী (সা.)-এর সময় তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর(খোদার ওপর নীর্ভরতার) নমুনাগুলো কেমন ছিল? মহানবী (সা.) যখন হিজরতের অনুমতি পেলেন, তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে নিজের হিজরতের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর ওপর এক আত্মোৎসর্গমূলক কাজের দায়িত্ব সঁপে দিলেন–আর তা হলো, আজ রাতে তিনি হুজুর (সা.)-এর পবিত্র বিছানায় সেই সবুজ বা এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী লাল রঙের 'হাযরামী' চাদর গায়ে



দিয়ে ঘুমাবেন। (এটি ইয়েমেনের তৈরি চাদর ছিল, অঞ্চলের নামানুসারে একে হাযরামী বলা হতো)।

যা হোক, নবী করীম (সা.) নিজে যে চাদরটি গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন, সেটি মুড়ি দিয়েই যেন ঘুমায়; এবং নিজের সেই অনুগত আত্মোৎসর্গকারী খাদেমকে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বললেন, "চিন্তা করো না, নিশ্চিন্তে আমার বিছানায় শুয়ে থেকো; শত্রু তোমার কেশাগ্রও বাঁকা করতে পারবে না।"

তদুপরি, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেহেতু মক্কাবাসীদের রাখা আমানতসমূহের বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং তিনি দায়বদ্ধতা অনুভব করছিলেন, তাই বললেন যে তিনি (হযরত আলী) যেন আমানতগুলো লোকজনকে ফেরত দিয়ে তাঁর পেছনে মদীনায় চলেন আসেন।

এরপর মহানবী (সা.) নিজ গৃহ থেকে বাইরে আসলেন, যখন মক্কার কাফেরদের বাছাইকৃত বীরেরা–যাদের চোখ থেকে যেন রক্ত ঝরছিল–হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে নবী আকরাম (সা.)–এর ঘরের ঠিক বাইরেই অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল যে, কখন রাত গভীর হতেই আমরা একযোগে আক্রমণ চালিয়ে এক আঘাতেই–নাউযু বিল্লাহ্–রসূল আকরাম (সা.)–এর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেবে। আর আবু জাহেল, যে তাদের সর্দার ছিল, অত্যন্ত অহংকার ও উপহাসের সুরে বলছিল: "মুহাম্মদ দাবি করে যে, তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তবে তোমরা আরব ও অনারবের বাদশাহ হয়ে যাবে; মৃত্যুর পর যখন তোমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে, তখন তোমাদের জন্য জর্ডানের উদ্যানসমূহের ন্যায় বাগানসমূহ তৈরি করা হবে; আর যদি তোমরা এমন না করো, তবে তোমাদের মধ্যে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবে।"

হুজুর (সা.) যাত্রার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন এবং বললেন: "হ্যাঁ, আমি এমনই বলে থাকি।" আর সূরা ইয়া–সীন–এর এই আয়াতসমূহ পাঠ করতে লাগলেন:

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

এর অনুবাদ হলো: 'ইয়া সাইয়্যিদু' অর্থাৎ! হে পূর্ণতম নেতা! শপথ প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের, নিশ্চয় তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত। (আর তুমি) সরল সুদৃঢ় পথে (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছ। এটি মহাপরাক্রমশালী, বার বার কৃপাকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যেন তুমি এরূপ এক জাতিকে সতর্ক করো, যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয় নি। অতএব তারা উদাসীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে; কেননা তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে (আমাদের) কথা পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না। নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ফলে তারা মাথা উঁচিয়ে রাখছে। আর আমরা তাদের সামনেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছি এবং পেছনেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমরা তাদেরকে পর্দাবৃত করে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না। (সূরা ইয়া–সীন ৩৬:২–১০)

হুজুর (সা.) এই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতে করতে এবং তাদের মুখে ছাই দিয়ে তাদের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন; কিন্তু খোদার কুদরত দেখুন, যাওয়ার সময় তিনি কারে সামনে দৃশ্যমান হননি! বরং তারা মাঝে মাঝেই ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছিল আর নিশ্চিত হচ্ছিল যে মুহাম্মদ (সা.) নিজের বিছানাতেই আছেন।[আসসীরাতুন নববিয়া লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪২]

মহানবী (সা.)–এর হিজরত এবং তাঁর এই তাওয়াক্কুলের কথা ঐতিহাসিক উদ্ধৃতির বরাতে হযরত মুসলেহ মাউদ (রা.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হলো:

মহানবী (সা.) আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ লাভ করে হযরত আবু বকর (রা.)–কে সঙ্গে নিয়ে সওর অভিমুখে রওনা হন; যা মক্কা থেকে প্রায় ছয়–সাত মাইল দূরে অবস্থিত এবং সেই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহায় সংগোপনে আশ্রয় নেন। সকালে কাফিররা যখন দেখল, তিনি (সা.) নিজ ঘরে উপস্থিত নেই এবং সব ধরনের পাহারা সত্ত্বেও তিনি (সা.) সফলভাবে বেরিয়ে গিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তারা তাঁর (সা.) সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আর তারা মক্কার কয়েকজন দক্ষ অনুসন্ধানকারীকে সঙ্গে নেয়, যারা পায়ের চিহ্ন শনাক্ত করার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। তারা তাদেরকে সওর পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং বলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) যদি থাকেন তাহলে এখানেই আছেন; এরপর আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। তখন এমন অবস্থা হয়েছিল, শত্রুরা গুহার একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং গুহার মুখও এতটা সংকীর্ণ ছিল না যে, ভেতরে উঁকি দেওয়া কষ্টকর হবে বরং এটি প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট উন্মুক্ত গুহা, যার ভেতরে উঁকি দিলে খুব সহজে বোঝা সম্ভব ছিল, ভেতরে কেউ অবস্থান করছে কি না। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.)–এর মাঝে কোনো আতঙ্কের ছাপ পড়ে নি, বরং তাঁর পবিত্র সত্তার কল্যাণে হযরত আবু বকর (রা.)–এর হৃদয়ও দৃঢ় ছিল। তিনি মূসা (আ.)–এর সঙ্গীদের মতো একথা বলেন নি, আমরা তো ধরা পড়ে গেছি। তিনি (রা.) কেবল এতটুকু বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! শত্রুরা আমাদের এতটা নিকটে এসে গেছে যে, তারা সামান্য নীচে তাকালেই আমাদের দেখতে পাবে। সে মুহূর্তে মহানবী (সা.) বলেন, ***লা –তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা।*** অর্থাৎ হে আবু বকর! চুপ থাকুন। আমরা এখন দুইজন নই; আমাদের সাথে তৃতীয়জন আল্লাহও আছেন। তাই তারা কীভাবে আমাদের দেখতে পাবে? ফলাফল তা–ই হলো। শত্রুরা গুহার একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের সাধ্যে কুলালো না যে, তারা আরেকটু এগিয়ে গুহার ভেতরে উঁকি দেবে। আর তারা সেখান থেকে বড়বড় করতে করতে অর্থাৎ ধ্বংস ধ্বংস বলতে বলতে, বৃথাচার করতে করতে ফিরে যায়। এ ঘটনার একটি দিক হলো– মূসা (আ.)–এর সঙ্গীসাথিরা ভীত হয়ে বলেছিল, হে মূসা! আমরা তো ধরা পড়ে গেছি। যেন তারা নিজেদের সঙ্গে মূসা (আ.)–কেও মিলিয়ে ফেলেছিল এবং মনে করেছিল, এখন আমরা সবাই ফেরাউনের হাতে ধরা পড়ব। পক্ষান্তরে মহানবী (সা.)–এর খোদাভরসা, তাঁর সঙ্গীর ওপরও এমন প্রভাব ফেলে যে, তাঁর মুখ থেকে একথা বের হয় নি, আমরা তো ধরা পড়ে গেছি বরং তিনি শুধু এতটুকুই বলেন, শত্রু এতটা নিকটে এসে গেছে যে, তারা যদি আমাদের দেখতে চায় তাহলে দেখতে পারে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর এ আশঙ্কা বা ধারণাটুকুও মেনে নেন নি। তিনি (সা.) বলেন, এমন ধারণা কোরো না। আমরা এখন দুইজন নই বরং আমাদের সাথে আরো একজন সত্তা রয়েছেন আর তিনি হলেন আমাদের খোদা।

[তফসীরে কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪১৬–৪১৭]

হিজরতের ঘটনা এবং মহানবী (সা.)–এর খোদাভরসা ও সাহসিকতার বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিষ্ঠা সেই কঠিন বিপদের সময় প্রকাশ পেয়েছিল, যখন মহানবী (সা.)–কে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। যদিও কারো কারো মত ছিল নির্বাসিত করার, কিন্তু মূল পরিকল্পনা ছিল তাঁকে হত্যা করার। এমন পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যা অনন্তকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই কঠিন মুহূর্তে মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গী হিসেবে হযরত সিদ্দীককে বেছে নেওয়া তাঁর (রা.) শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম বিশ্বস্ততার এক শক্তিশালী প্রমাণ। তিনি (আ.) এখানে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)–এর গুণাবলিও বর্ণনা করছেন।

একইভাবে এটি মহানবী (সা.)–এর নির্বাচন ছিল। সে সময় তাঁর (সা.) কাছে প্রায় সত্তর–আশিজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত আলী (রা.)–ও তাঁর কাছে ছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাঁদের সবার মাঝ থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)–কে নির্বাচন করেন। এর মাঝে রহস্য কী? নিগূঢ় তাৎপর্য কী? বিষয় হলো, নবী খোদার চোখে দেখেন এবং তাঁর জ্ঞানও খোদা তা'লার কাছ থেকেই লাভ হয়। এ কারণে আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)–কে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ কাজের জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীকই সবচেয়ে উত্তম ও যোগ্য।

হযরত আবু বকর (রা.) সেই কঠিন সময়ে মহানবী (সা.)–এর সঙ্গী হয়েছিলেন। এটি ছিল এক ভয়াবহ পরীক্ষার সময়। হযরত ঈসা (আ.)–এর জীবনে যখন এহেন মুহূর্ত এসেছিল, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের একজন প্রকাশ্যেই তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই পূর্ণ বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মোটকথা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)–কে পুরোপুরি সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাকে গারে সওর (তথা সওর গুহা) বলা হয়। কুচক্রী কাফিররা মহানবী (সা.)–কে কষ্ট দেওয়ার নিমিত্তে নানা পরিকল্পনা করে খুঁজতে খুঁজতে সেই গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, এখন তো তারা একেবারে আমাদের মাথার ওপর এসে গেছে। কেউ যদি সামান্য নীচের দিকে তাকায়, তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে এবং আমরা ধরা পড়ে যাব। মহানবী (সা.) তখন বলেন, ***লা –তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা।*** অর্থাৎ দুঃখ কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এ শব্দগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করুন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে বলেছেন– ***লা –তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা।*** নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এখানে 'মাআনা' শব্দে তারা উভয়ে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তোমার এবং আমার সাথে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা এক পাল্লায় মহানবী (সা.)–কে এবং অপর পাল্লায় হযরত আবু বকর সিদ্দীককে রাখেন। সে সময় তাঁরা দুইজনই পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। কারণ এটিই ছিল সেই স্থান, যেখান থেকে হয় ইসলামের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হবার ছিল নতুবা ইসলামের সমাপ্তি ঘটার ছিল। শত্রুরা গুহার মুখে উপস্থিত ছিল এবং নানা ধরনের মতামত ব্যক্ত হচ্ছিল । কেউ বলছিল, এ গুহায় খুঁজে দেখো, কেননা পায়ের চিহ্ন এ পর্যন্ত এসেই শেষ হয়েছে। আবার তাদের কেউ কেউ বলছিল, এখানে মানুষের যাতায়াত কীভাবে সম্ভব? গুহার মুখে তো মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে এবং কবুতর ডিম পেড়ে রেখেছে। তাদের এসব কথার আওয়াজ গুহার ভেতর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল এবং মহানবী (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সেসব কথা শুনছিলেন। শত্রুরা মহানবী (সা.)–

কে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে এসে পড়ে এবং তারা উন্মাদের মতো ছুটে আসে। কিন্তু তাঁর (সা.) পরম সাহসিকতার দিকটি খেয়াল করুন! শত্রুরা তাঁর মাথার ওপর ঠায় দাড়িয়ে, অথচ তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান সাথি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বলছেন, ***লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা।*** এ শব্দগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, মহানবী (সা.) তার মুখে শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন কারণ এটি শ্রুত শব্দের মুখাপেক্ষী; কেবল ইশারা-ইঙ্গিত যথেষ্ট ছিল না। বাইরে শত্রুরা পরামর্শ করছে আর গুহার ভেতরে মনিব ও সেবকও আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁরা এ বিষয়ে কোনো তোয়াক্কা করেন নি যে, শত্রুরা শব্দ শুনে ফেলতে পারে। এটি আল্লাহ তা'লার প্রতি তাঁর (সা.) পরিপূর্ণ ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানের একটি প্রমাণ। আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি তাঁর (সা.) পূর্ণ আস্থা ছিল। " [মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৯-৩৪১]

হিজরতের এই সফরের আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলোতেও তাঁর (সা.) খোদাভরসার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইনশাআল্লাহ, সেগুলো আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

[আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬]

২ পাতার পর.....

*****

পুরুষদের কাজ নয়। পুরুষদের দায়িত্ব হলো নারীদের শিক্ষা দেওয়া। অন্যদিকে, জামাতের সাংগঠনিক ব্যবস্থায় লাজনা ইমাআল্লাহর ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; নারীদের নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। কুরআন পাঠ ও শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নারীদের উচিত এদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া এবং এ বিষয়ে চেষ্টা করা। বর্তমানে বহু শিক্ষিত নারী ও মেয়ে রয়েছেন। তাঁরা যেখানে কুরআন করিম পাঠ করা শিখবেন, সেখানে এর অনুবাদও শিখবেন। এরপর দেখবেন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি কী কী। কুরআন করিমের তারতীলের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। শুধু পাঠ করানোই উদ্দেশ্য নয়; বরং এ নিয়ত থাকা উচিত যে, এর ওপর আমল করতে হবে। কোন কোন কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা জানতে হবে। যখন তাঁরা এভাবে আমল করবেন, তখনই প্রকৃত আহমদী বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হবেন।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন,

কুরআন করিমে পর্দা, শালীনতাপূর্ণ পোশাক, হিজাব এবং পুরুষদের থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সমাজে এসব বিষয় উপেক্ষা করা হয় এবং এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। আপনাদের কর্তব্য হলো, কুরআন করিমের এসব নির্দেশের ওপর আমল করা। তাহলেই আপনারা একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তাহলেই পুরুষদের সংশোধনকারী হতে পারবেন এবং ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন, স্মরণ রাখবেন, প্রত্যেক আহমদী মুসলমান-তিনি পুরুষ হোন অথবা নারী-তাঁর জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ কেমন ছিল? তিনি বলেন, আমাদের নবী (সা.) নিজের আদর্শের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, আমার জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর জন্য। এখন আমাদের অবস্থা কী? আমরা কালেমা পাঠ করি এবং বলি যে, আমরা মুসলমান। কিন্তু প্রকৃত মুসলমানের উদ্দেশ্য তো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। কীভাবে তাঁর প্রকৃত বান্দা হতে হয়, তা উপলব্ধি করা। অথচ বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা কী? আমরা যদি নিজেদের পর্যালোচনা করি, তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারব যে, আমরা কী অবস্থায় রয়েছি। আমরা পৃথিবীর জন্য বেঁচে থাকতে চাই এবং পৃথিবীর জন্যই মৃত্যুবরণ করতে চাই। ইউরোপে এসে আমাদের অগ্রাধিকারসমূহ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমরা পার্থিব বিষয়ের সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছি। আমরা প্রশ্ন করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের দোয়া শোনেন না কেন? এর কারণ কী? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আগে আমার নির্দেশাবলি মেনে চলো, তাহলে আমিও তোমাদের দোয়া শুনব।

হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেছেন, মুসলমান হওয়া সহজ কোনো বিষয় নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করবে না এবং তাঁর আদর্শ নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ো না। কেবল বাহ্যিক আবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকো না; বরং এর নির্যাস ও আত্মার সন্ধান করো। ইসলামের শিক্ষার ওপর আমল করার চেষ্টা না করা পর্যন্ত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা না করা পর্যন্ত সেই আত্মাকে লাভ করা সম্ভব নয়।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন,

বর্তমানে আমি মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে খুতবা প্রদান করছি। সেগুলোও মনোযোগসহকারে শোনা, তার ওপর আমল করা এবং নিজেদের জীবনে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহে মওউদ (আ.) ইসলামের অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত থাকতেন। একবার তিনি অত্যন্ত বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আমি কীভাবে বোঝাব যে, ইসলামের কী অবস্থা হয়ে যাচ্ছে! এ যুগ এমন একটি সময়, যখন তোমাদের আত্মত্যাগ করতে হবে, ধর্ম শিখতে হবে এবং ধর্মের প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করব, আমাদের নারী, শিশু, পুরুষ ও যুবকেরা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও শিক্ষার অনুসারে পরিচালিত করার চেষ্টা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দাবি করতে পারি না যে, আমরা প্রকৃত মুসলমান।

এ বিষয়ে অত্যন্ত বেশি চেষ্টা ও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সমাজে বিদ্যমান মন্দ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকাও জরুরি। হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেছেন, বর্তমান যুগে যেসব কষ্ট ও বিপদ রয়েছে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকো, দোয়ায় নিবিষ্ট থাকো এবং নিজেদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত চেতনা সৃষ্টি করো।

বর্তমান যুগের এসব কষ্ট ও বিপদ কী? টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এগুলোতে নোংরামি, অশ্লীলতা ও ভুল পথনির্দেশনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এসব মাধ্যম মানুষের নৈতিকতাও নষ্ট করে দিয়েছে এবং নৈতিক মূল্যবোধকে অত্যন্ত নিচে নামিয়ে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আহমদী পুরুষ, নারী ও যুবকদের কর্তব্য হলো, এসব বিষয় থেকে নিজেদের রক্ষা করা এবং এগুলোর মোকাবিলা করা, প্রতিবাদ জানানো ও প্রভাব দূর করার জন্য চেষ্টা করা। একই সঙ্গে নিজেদের আদর্শও উপস্থাপন করতে হবে। নতুন প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে মন্দের বিপরীতে নেকি ও কল্যাণের কথা প্রচার করতে হবে। এ কাজ কেবল নিজেদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়; এর জন্যও দোয়া করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, দোয়ায় নিবিষ্ট থাকো এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করো, যে আদর্শের মাধ্যমে একসময় বিপ্লব এসেছিল। অতএব, যদি বিপ্লব সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে আত্মত্যাগ ও দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বলতে পারব না যে, আমরা আহমদী মুসলমান।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, নিজেদের ঘরে নামাজের প্রচলন প্রতিষ্ঠা করুন। কিছু নারী বলেন, তাঁরা যখন পুরুষদের নামাজের কথা বলেন, তখন পুরুষেরা রাগ প্রকাশ করেন। অতএব, আপনারা কৌশল ও প্রজ্ঞার সঙ্গে বারবার তাঁদের বলতে থাকুন। সন্তানদেরও বলতে থাকুন। সন্তানদের বিষয়ে পুরুষদের বোঝাতে থাকুন যে, তোমরা নিজেরা আমল না করলে সন্তানরাও আমল করবে না এবং আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরে যাবে। এরপর তারা অভিযোগ করবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করা যাচ্ছে না এবং তিনি দোয়া শুনছেন না। অতএব, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে হলে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। এভাবে যদি আমরা নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি, তাহলেই আমরা সেই মানুষ এবং সেই আহমদীতে পরিণত হতে পারব, যাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন।

হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন,

বর্তমানে আমি মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এবং এ যুগে তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর আদর্শের বিভিন্ন গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করছি। হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর আদর্শ কেমন ছিল এবং এ যুগে তিনি কীভাবে সেই আদর্শগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন, দেখুন, শুনুন এবং সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করুন।

হযরত মসীহে মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, এ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগো না যে, আমরা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি অথবা ছোটখাটো অপরাধ থেকে নিজেদের রক্ষা করি। এসব গুণের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং মুশরিকেরাও তোমাদের সঙ্গে অংশীদার। বর্তমানে গণমাধ্যমে এমন সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, যেগুলো দেখার ফলে মানুষ সরাসরি কোনো কাজে লিপ্ত না হলেও মানসিক ও নৈতিক পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি কিছু আহমদী মুসলমানও, বরং নৈতিকতাসম্পন্ন ও ভদ্র মানুষও এসব অনুষ্ঠান পছন্দ করেন। এর ফলে তাঁরা নিজেদের ক্ষতি করেন, নিজেদের নৈতিকতা ধ্বংস করেন এবং সমাজের ওপরও খারাপ প্রভাব ফেলেন।

কিন্তু আমাদের আল্লাহ তা'আলার অধিকার এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। যদি এসব গুণ আমাদের মধ্যে না থাকে এবং আমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া লোকদের অনুসরণ করতে থাকি, নিজেদের অধিকার আদায় করার চেষ্টা করি অথচ কর্তব্য পালনের প্রতি মনোযোগ না দিই এবং পৃথিবীকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে ফেলি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে আমাদের আহমদী মুসলমান হওয়ার কোনো মূল্য থাকবে না।

আল্লাহ করুন, সকল নারী ও পুরুষ যেন নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করেন এবং হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর মিশন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হন। তাঁরা যেন জলসায় আগমনের উদ্দেশ্যও পূর্ণ করতে পারেন। তখনই আমরা বলতে পারব যে, আমরা আহমদী মুসলমান এবং এ পরিচয় ছাড়া আমাদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ কাজ করার তৌফিক দান করুন।

হুযূরে আনওয়ারের ভাষণ দুপুর ১২টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর হুযূরে আনওয়ার দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার পর নাসেরাত ও লাজনা ইমাআল্লাহর সদস্যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারানা পরিবেশন করেন।

এরপর হুযূরে আনওয়ার বলেন, জার্মানির লাজনা ইমাআল্লাহর উপস্থিতির সংখ্যা ১১,৪৯৪ জন। পাশাপাশি তিনি উপদেশ দেন যে, আপনারা যে তারানা পরিবেশন করেন, তারানা পরিবেশনের উদ্দেশ্য শুধু গান গাওয়া নয়; বরং এর শিক্ষার ওপর আমল করার চেষ্টা করাও প্রয়োজন। সালাম বিনিময়ের পর দুপুর ১২টা ৪৩ মিনিটে হুযূরে আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয) আইওয়ানে মাসরুর থেকে প্রস্থান করেন।



সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

নবুয়তের সূচনা

প্রথম ঈমান আনয়নকারীগণ

পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। তিনি হজরত আবু বকর (রা.)-এর গোত্র অর্থাৎ বনু তাইম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তখন সম্পূর্ণ যুবক ছিলেন। তালহাও ইসলামের একনিষ্ঠ আত্মনিবেদিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হজরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে উটের যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

এই পাঁচজন সাহাবি আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাঁরা সেই দশজন বিশিষ্ট সাহাবির অন্তর্ভুক্ত, যাঁদেরকে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরা মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহাবি ও পরামর্শদাতা হিসেবে গণ্য হতেন।

এই ব্যক্তিদের পর যাঁরা প্রথম দিকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আবার কেউ অন্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ:

আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রা.), যাঁর নেতৃত্বে হজরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে সিরিয়া বিজিত হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত সৎ ও সুফি-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে 'আমিনুল মিল্লাত' অর্থাৎ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপাধি প্রদান করেছিলেন। আবু উবাইদা কুরাইশদের বনু খালজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কখনো কখনো ফিহর ইবনে মালিকের বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তাঁকে ফিহরি বলেও অভিহিত করা হতো। হজরত আয়েশা (রা.)-এর দৃষ্টিতে আবু উবাইদার এতটাই মর্যাদা ছিল যে, তিনি বলতেন, হজরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময় আবু উবাইদা জীবিত থাকলে তিনিই খলিফা হতেন। হজরত আবু বকর (রা.)-ও আবু উবাইদাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। এ কারণে মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর হজরত আবু বকর (রা.) যাঁদের খিলাফতের যোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবু উবাইদাও ছিলেন। আবু উবাইদা (রা.) আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হজরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে প্লেগ মহামারিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর ছিলেন উবাইদা ইবনে হারিস (রা.), যিনি বনু মুত্তালিব গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন। এরপর ছিলেন আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ (রা.), যিনি মহানবী (সা.)-এর দুধ-সম্পর্কীয় ভাই ছিলেন এবং বনু মাখজুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-কে বিবাহ করেন।

আবু হুযাইফা ইবনে উতবা (রা.) বনু উমাইয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা উতবা ইবনে রবিয়া কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। হজরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে আবু হুযাইফা (রা.) শহিদ হন।

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) বনু আদি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হজরত উমর (রা.)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের পুত্র ছিলেন। যায়েদ ইবনে আমর জাহেলি যুগেই শিরক পরিত্যাগ করেছিলেন। সাঈদ (রা.)-ও আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আমির মুয়াবিয়ার শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন।

উসমান ইবনে মাযউন (রা.) বনু জুমাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুফি-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জাহেলি যুগেই তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি সংসার ও পার্থিব জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁকে এ অনুমতি দেননি। তিনি বলেছিলেন, ইসলামে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসজীবন বৈধ নয়।

আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা.)-এর বাড়ি সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে মহানবী (সা.) সেই বাড়িটিকেই তাঁর ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আরকাম (রা.) বনু মাখজুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এরপর ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশ। তাঁরা দুজনই মহানবী (সা.)-এর পিসতুতো ভাই ছিলেন, তবে তাঁরা কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.), যাঁকে পরবর্তীকালে মহানবী (সা.) বিবাহ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই বোন।

উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশ সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা জাহেলি যুগেই মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছিলেন। ইসলাম প্রচারিত হলে তিনি মুসলমান হন। কিন্তু হাবশায় হিজরত করে যাওয়ার পর কোনো এক কারণে তিনি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে হাবিবা (রা.), যিনি কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন, পরবর্তীকালে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

এই ব্যক্তিদের ছাড়াও ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত ছিলেন না; বরং হুযাইল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন এবং কুরাইশ নেতা উকবা ইবনে আবি মুয়াইতের ছাগল চরাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। হানাফি ফিকহের ভিত্তি প্রধানত তাঁর বক্তব্য ও ইজতিহাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এরপর ছিলেন বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.)। তিনি উমাইয়া ইবনে খালফের একজন হাবশি ক্রীতদাস ছিলেন। হিজরতের পর মদিনায় আজান দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর ওপরই অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি আজান দেওয়া বন্ধ করে দেন। পরে হজরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সিরিয়া বিজিত হলে, একবার হজরত উমর (রা.)-এর বিশেষ অনুরোধে তিনি আবার আজান দেন। এতে উপস্থিত সকলের মনে মহানবী (সা.)-এর যুগের স্মৃতি ভেসে ওঠে। ফলে বিলাল (রা.) নিজে, হজরত উমর (রা.) এবং তখন সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবি বারবার ককিয়ে কেঁদে উঠছিলেন।

হজরত উমর (রা.) বিলাল (রা.)-কে এত ভালোবাসতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর হজরত উমর (রা.) বলেছিলেন, "আজ মুসলমানদের নেতা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।" একজন দরিদ্র হাবশি ক্রীতদাস সম্পর্কে তৎকালীন শাসকের এ ছিল মন্তব্য।

এরপর ছিলেন আমির ইবনে ফুহাইরা। হজরত আবু বকর (রা.) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিজের কাছে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

এরপর ছিলেন খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.)। তিনি ছিলেন দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি। সেই সময় তিনি মক্কায় লৌহকারের কাজ করতেন।

এরপর ছিলেন আবু যার (রা.), যিনি গিফার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের দাবির কথা শুনে তিনি বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য তাঁর ভাইকে মক্কায় পাঠান। তাঁর ভাই মক্কায় গিয়ে ফিরে এসে আবু যার (রা.)-কে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু এতে আবু যার (রা.)-এর মন তৃপ্ত হয়নি। তাই এরপর তিনি নিজেই মক্কায় আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি সহিহ বুখারিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

আবু যার (রা.) অত্যন্ত সংসারবিমুখ, সংযমী ও সুফি-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কোনো অবস্থাতেই সম্পদ সঞ্চয় করা বৈধ নয়। এ কারণে কখনো কখনো অন্যান্য সাহাবির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ও বিরোধের সৃষ্টি হতো।

এই কয়েকজন ব্যক্তি সেইসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক তিন-চার বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিবাহিত ছিলেন, তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানরাও সাধারণত তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। এ কারণে ইতিহাসবিদেরা সেই সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী নারীদের মধ্যে হজরত খাদিজা (রা.)-এর পর বিশেষভাবে হজরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) এবং সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের নাম উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া নারীদের মধ্যে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর স্ত্রী উম্মে ফজলও প্রথম দিকের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তখন পর্যন্ত আব্বাস (রা.) নিজে ইসলাম গ্রহণ করেননি।

যাই হোক, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তিন-চার বছরের ধর্মপ্রচারের নিরলস প্রচেষ্টার ফল ছিল এই অল্পসংখ্যক মানুষ। কিন্তু এই অগ্রবর্তী প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে হজরত আবু বকর (রা.) ছাড়া আর কেউই এমন ছিলেন না, যাঁর কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বা মর্যাদা ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ক্রীতদাস এবং অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র ও দুর্বল। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কুরাইশদের অভিজাত পরিবারগুলোর সঙ্গেও সম্পর্কিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন যুবক। বরং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রায় শিশুই বলা উচিত। তাই তাঁরা তখনও এমন বয়সে পৌঁছাননি, যখন নিজেদের গোত্রের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। আর যাঁরা বয়স্ক ছিলেন, তাঁরা দারিদ্র্য অথবা অন্য কোনো কারণে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন না।

এই কারণে কুরাইশদের মধ্যে সাধারণ ধারণা ছিল যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে কেবল ছোট ও দুর্বল লোকেরাই মেনে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েক বছর পরের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মুহাম্মদ (সা.)-কে কি বড় ও প্রভাবশালী লোকেরা মেনে নিয়েছে, নাকি দুর্বল ও সাধারণ লোকেরা?" তখন আবু সুফিয়ান এই উত্তরই দিয়েছিলেন যে, "দুর্বল ও সাধারণ লোকেরা তাঁকে মেনে নিয়েছে।" এর পরিপ্রেক্ষিতে হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন, এবং যথার্থই বলেছিলেন, "আল্লাহর রাসুলদের প্রথম দিকে সাধারণ ও দুর্বল লোকেরাই মেনে নিয়ে থাকে।"

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

১০৭) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মাওলভি জুলফিকার আলী খান সাহেব আমাকে বর্ণনা করেন যে, করম দীনের মামলার জন্য হজরত সাহেব যখন গুরুদাসপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন এলাহাবাদ থেকে তিনজন অ-আহমদি অতিথি তাঁর কাছে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মাওলভি ইলাহি বখশ। হজরত সাহেবের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা যুক্তি মেনে নেন।

একবার হজরত সাহেব যখন বাড়ির উঠানে পায়চারি করছিলেন, তখন মাওলভি ইলাহি বখশ সাহেবও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন। মাওলভি ইলাহি বখশ সাহেব হজরত সাহেবকে বললেন, "আমি যদি বাইআত গ্রহণ করি, তাহলে আমার সঙ্গে আরও অনেক মানুষ বাইআত গ্রহণ করবে।"

হজরত সাহেব হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেলেন। তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "এতে আমার কী আসে যায়! এটি আল্লাহর কাজ। তিনি নিজেই মানুষের ঘাড় ধরে ধরে তাদের আমার পায়ের কাছে নত করাবেন এবং করাচ্ছেন।"

খান সাহেব বলতেন, মাওলভি ইলাহি বখশ সাহেব কথাগুলো এমনভাবে বলেছিলেন, যাতে কিছুটা অনুগ্রহ প্রদর্শনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

খান সাহেব আরও বর্ণনা করেন, পরদিন যখন মাওলভি সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা ফিরে যেতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁরা হজরত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি মাওলভি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলুন মাওলভি সাহেব, এখন আর কোনো আপত্তি অবশিষ্ট আছে কি?

মাওলভি সাহেব বললেন, "না, আমার মন সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হয়েছে।"

আমি বললাম, "তাহলে বাইআত?

হজরত সাহেব বললেন, "খান সাহেব, এ কথা বলা আপনার অধিকার নয়। আমাদের কাজ হলো বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এরপর তা গ্রহণ করা বা না করা তাঁদের কাজ।"

যাই হোক, তাঁরা ফিরে চলে গেলেন।

তিন-চার দিন পর হজরত সাহেব কাদিয়ানে এলেন। আমিও সেখানে এলাম। তখন হুজুর আমাকে ডেকে হাসিমুখে নিজের রুমাল দিয়ে একটি পোস্টকার্ড খুলে আমার দিকে ছুড়ে দিলেন এবং বললেন, "তহশিলদার সাহেব! আপনি তো তাড়াহুড়ো করছিলেন। নিন, তাঁদের চিঠি এসে গেছে।"

আমি চিঠিটি দেখলাম। সেটি ছিল মাওলভি ইলাহি বখশ সাহেবের লেখা। তিনি পেনসিল দিয়ে চিঠিটি লিখেছিলেন এবং পথিমধ্যে লক্ষ্ণৌ থেকে পাঠিয়েছিলেন।

চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "ট্রেনে বসে আমি চিন্তা করলাম, এখন যখন আমার কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, তখন যদি আমি পথের মধ্যেই মারা যাই, তাহলে আল্লাহকে কী জবাব দেব? তাই আমি হুজুরের প্রতিষ্ঠিত জামাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। অনুগ্রহ করে আমার বাইআত গ্রহণ করুন।"

হজরত সাহেব বললেন, "মানুষ যখন অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন চিন্তা করার জন্য ভালো সুযোগ পায়। সে অতীতের ঘটনাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।"

১০৮)পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মাওলভি সৈয়দ সরওয়ার শাহ সাহেব আমাকে বর্ণনা করেন যে, করম দীনের সঙ্গে মামলার যে সময় গুরুদাসপুরে বিচার চলছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট পরবতী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তখন হজরত সাহেব কাদিয়ানে অবস্থান করছিলেন। নির্ধারিত তারিখের দুদিন আগে হুজুর আমাকে গুরুদাসপুরে পাঠালেন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে কয়েকটি উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র সংগ্রহ করে প্রস্তুত রাখি। কারণ, পরবতী শুনানিতে সেগুলো আদালতে পেশ করার কথা ছিল। হুজুর আমার সঙ্গে শেখ হামিদ আলী এবং বাবুর্চি আবদুর রহিম নাপিতকেও গুরুদাসপুরে পাঠিয়ে দিলেন।

আমরা যখন গুরুদাসপুরের বাড়িতে পৌঁছালাম, তখন নিচ থেকে মরহুম ডা. মুহাম্মদ ইসমাইল খান সাহেবকে ডাকলাম, যাতে তিনি নিচে এসে দরজা খুলে দেন। ডাক্তার সাহেব তখন বাড়ির ওপরের তলায় অবস্থান করছিলেন। আমাদের ডাক শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কাঁদতে ও চিৎকার করতে শুরু করলেন। আমরা তাঁকে কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু তিনি একইভাবে কাঁদতে থাকলেন। অবশেষে কিছুক্ষণ পর তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে নিচে নেমে এলেন।

আমরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, "আমার কাছে মুহাম্মদ হুসাইন মুন্সি এসেছিলেন।"

মাওলভি সাহেব বলতেন, উল্লিখিত মুহাম্মদ হুসাইন গুরুদাসপুরের কোনো আদালতে মুহুরি অথবা পেশকার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জামাতের কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং মাওলভি মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভির পরিচিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যাই হোক, ডাক্তার সাহেব বর্ণনা করলেন, মুহাম্মদ হুসাইন মুন্সি তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন, "আজকাল এখানে আর্যদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকজন আর্য তাঁদের বন্ধুদেরও সেই সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সূত্রে আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। সভার সাধারণ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, সভার কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং এখন সবাই চলে যেতে পারেন, কারণ তাঁদের কিছু ব্যক্তিগত আলোচনা করতে হবে। ফলে বাইরের লোকেরা সবাই উঠে চলে গেলেন। আমিও চলে যেতে উদ্যত হলাম। কিন্তু আমার আর্য বন্ধু বললেন, আমরা একসঙ্গে যাব। আপনি এক পাশে গিয়ে বসুন অথবা বাইরে অপেক্ষা করুন। তাই আমি সেখানে এক পাশে গিয়ে বসে রইলাম।

"এরপর আর্যদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়ালেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে মির্জা সাহেবের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'এই ব্যক্তি আমাদের কঠোর শত্রু এবং আমাদের নেতা লেখরামের হত্যাকারী। এখন তিনি আপনার হাতে শিকারের মতো এসে পড়েছেন, আর সমগ্র জাতির দৃষ্টি আপনার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে। আপনি যদি এই শিকারকে হাতছাড়া হতে দেন, তাহলে আপনি জাতির শত্রু বলে গণ্য হবেন।' এ ধরনের আরও অনেক উত্তেজনামূলক কথা তিনি বললেন।

"এর জবাবে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'আমার তো আগে থেকেই ইচ্ছা যে, সুযোগ পেলে শুধু মির্জাকেই নয়, এই মামলায় তাঁর যত সঙ্গী ও সাক্ষী রয়েছে, তাদের সবাইকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কী করা যাবে! মামলাটি এত সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে যে, হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখন আমি অঙ্গীকার করছি, যা-ই ঘটুক না কেন, পরবতী শুনানিতেই আমি বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

"মাওলভি সাহেব বলতেন, ডাক্তার সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী মুহাম্মদ হুসাইন তাঁকে আরও বলেছিলেন, 'আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি, বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অর্থ কী। প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তিনি মামলার শুরুতে অথবা বিচার চলাকালে যেকোনো সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন গ্রহণ না করেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠাতে পারেন।'

"মুহাম্মদ হুসাইন বলেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি জানেন যে, আমি আপনাদের জামাতের কঠোর বিরোধী। কিন্তু আমার মধ্যে একটি বিষয় রয়েছে-আমি কোনো সম্মানিত পরিবারকে অপমানিত ও ধ্বংস হতে দেখতে পারি না, বিশেষত হিন্দুদের হাতে তাদের অপমানিত হতে দেখতে পারি না। আমি জানি, মির্জা সাহেবের পরিবার এই জেলায় সবচেয়ে সম্মানিত পরিবার। তাই আমি আপনাকে এই খবরটি জানিয়ে দিলাম, যাতে আপনি এর কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন।

"'আমার মতে, এ ক্ষেত্রে দুটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রথমত, লাহোরের প্রধান আদালতে আবেদন করে এখান থেকে মামলাটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেকোনো উপায়ে হোক, মির্জা সাহেব যেন পরবতী শুনানিতে আদালতে উপস্থিত না হন এবং তাঁর পরিবর্তে একটি চিকিৎসা-সনদ পেশ করা হয়।'

মাওলভি সাহেব বর্ণনা করেন, ডাক্তার সাহেব যখন এই ঘটনাটি জানালেন, তখন আমরাও সবাই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, তখনই কাউকে কাদিয়ানে পাঠানো হবে, যিনি হজরত সাহেবকে ঘটনাগুলো জানাবেন।

রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা একটি ঘোড়ার গাড়ি খুঁজতে লাগলাম। সেখানে কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি থাকলেও বিরোধিতার উত্তেজনা এত বেশি ছিল যে, কোনো গাড়িচালকই যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। আমরা চারগুণ ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাবও দিলাম, কিন্তু তাতেও কোনো গাড়িচালক সম্মত হলেন না।

অবশেষে আমরা শেখ হামিদ আলী, বাবুর্চি আবদুর রহিম এবং আরও একজন ব্যক্তিকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ানের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁরা ফজরের নামাজের সময় কাদিয়ানে পৌঁছালেন এবং সংক্ষেপে হজরত সাহেবকে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

হুজুর অত্যন্ত নির্বিকারভাবে বললেন, "ঠিক আছে, আমরা বাটালায় চলে যাব। খাজা সাহেব ও মাওলভি মুহাম্মদ আলী সাহেব লাহোর থেকে ফেরার পথে সেখানে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব এবং মামলাটি স্থানান্তরের চেষ্টার ফল কী হয়েছে, তা-ও জানা যাবে।"

সুতরাং, সেদিনই হুজুর বাটালায় চলে এলেন। ট্রেনে মাওলভি মুহাম্মদ আলী সাহেব ও খাজা সাহেবের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। তাঁরা জানালেন, মামলাটি অন্যত্র স্থানান্তরের চেষ্টা সফল হয়নি।

এরপর হজরত সাহেব গুরুদাসপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। কিন্তু পথে খাজা সাহেব ও মাওলভি

শেষাংশ ১২ পাতায়....

সন্তানদের প্রতিপালন ও আহমদী মায়েদের দায়িত্বসমূহ

[ডা. মনসূরা ইলাহদ্দীন, কাদিয়ান]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৫)

তোমাদের কোল থেকে লালিত-পালিত হয়ে এমন সত্যনিষ্ঠ সন্তান বেরিয়ে আসুক,

যাদের হাতের মাধ্যমে ধর্ম সাহায্য ও সমর্থন লাভ করবে।

তোমাদের গৃহের প্রদীপগুলোর আলো এমন হোক,

যাদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব হেদায়াতের আলো লাভ করবে।

সম্মানিতা সভানেত্রী মহোদয়া, আমার প্রিয় বোনেরা ও কন্যারা!

আমার বক্তৃতার বিষয় হলো, "সন্তানদের প্রতিপালন এবং আহমদী মায়েদের দায়িত্বসমূহ-আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, নামাজ, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও উন্নত নৈতিক চরিত্র।"

আপনারা যে পবিত্র আয়াতটি শুনেছেন, তার অনুবাদ হলো: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জীবনসঙ্গী ও আমাদের সন্তানসন্ততি থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দাও।"

প্রিয় বোনেরা! আমরা আল্লাহতালার যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন, তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, তিনি আমাদের এই যুগের ইমামকে চিনতে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার তৌফিক দান করেছেন। আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে, যখন চারদিকে ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছিল এবং ইসলামের তরী ঘূর্ণাবর্তে আটকে দুলছিল, তখন আল্লাহতালা আমাদের নেতা হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি আল্লাহতালার সাহায্যে বিরোধিতার প্রচণ্ড ও তীব্র ঝড়ের মোকাবিলা করে ইসলামের তরীকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং আল্লাহর ধর্মের জন্য নিজেদের ধনসম্পদ, সম্মান ও সন্তানসন্ততি উৎসর্গ করতে প্রস্তুত-এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেন, যার প্রতি আজ শত্রুরাও স্বীকৃতি প্রদান করে যে, হ্যাঁ, এই যুগে যদি কোনো জামাত ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকে, তবে তা একমাত্র জামাতে আহমদীয়া।

প্রিয় বোনেরা! এই জামাতের সদস্য হওয়ার গৌরব আমাদের ওপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করে, সেগুলোর প্রতি আমি আমার বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এটি একটি বাস্তব সত্য এবং বিশ্ব ইতিহাস এর সাক্ষী যে, কোনো জাতির উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর রহস্য নিহিত রয়েছে নারীর বুদ্ধিমত্তা, সাহস, উদ্যম ও উন্নত চরিত্রের মধ্যে। একইভাবে, কোনো জাতির অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করলেও তাতে নারীর ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের নেতা হযরত মুসলে মওউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই সত্যের প্রতি লক্ষ রেখেই জামাতের নারীদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত উন্নতির জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম ব্যাকুলতা। তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টি উপলব্ধি করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতের নারীদের সংশোধন হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত জামাত উন্নতি করতে পারবে না। তিনি বলেন:

"প্রকৃত দায়িত্ব হলো শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব, যা নারীদের ওপর ন্যস্ত। আর এই দায়িত্ব জিহাদের দায়িত্বের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। শিশুদের প্রশিক্ষণ উত্তম হলে জাতির ভিত্তি মজবুত হয় এবং জাতি উন্নতি লাভ করে। আর তাদের প্রশিক্ষণ উত্তম না হলে একদিন না একদিন সেই জাতি অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব, কোনো জাতির উন্নতি ও ধ্বংস নির্ভর করে সেই জাতির নারীদের ওপরই। বর্তমান যুগের মায়েরা যদি নিজেদের সন্তানদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন, যেভাবে সাহাবিয়াগণ তাঁদের সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিতেন, তাহলে কি এটি সম্ভব ছিল না যে, তাঁদের সন্তানরাও সাহাবিয়াদের সন্তানদের মতো জাতির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গকারী সৈনিক হতো? আজও, আল্লাহ না করুন, যদি জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, তবে তার জন্য নারীরাই দায়ী হবেন।"

- আল-আযহার, পৃষ্ঠা ৩২৭।

সন্তানদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো পিতা-মাতার দোয়া। আল্লাহতালা সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্ব থেকে শুরু করে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বেই নেক ও পুণ্যবান সন্তান লাভের জন্য আল্লাহতালা এই দোয়া শিখিয়েছেন:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৯)

অর্থাৎ, "হে আমার প্রতিপালক! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র ও নেক সন্তানসন্ততি দান করো। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শ্রবণকারী।"

এরপর সন্তানদের নেক ও চোখের শীতলতা স্বরূপ করে তোলার জন্যও দোয়া শিখিয়েছেন:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৫)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততি থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দাও।"

অতএব, মায়েদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো দোয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা। সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্ব থেকেই দোয়াকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিতে হবে। এভাবে দোয়া করতে হবে: "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যে সন্তান দান করেছ, তাকে সঠিকভাবে লালন-পালন ও যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি আমাদের তৌফিক দান করো, যেন আমরা তাকে উত্তম পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিতে পারি, তাকে তোমার ধর্মের জন্য উৎসর্গকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পারি এবং এই সন্তান আমাদের জন্যও চোখের শীতলতার কারণ হয় ও তোমার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।"

আমাদের নেতা হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য দোয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার উপদেশও দিয়েছেন। তিনি শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া এবং অতিরিক্ত বকাঝকা করাকে অপছন্দ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, শিশুদের জন্য দোয়া করাকে নিজেদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করো। তাঁর বাস্তব জীবনের আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি নিজের সন্তানদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে তাঁর কাব্যিক রচনায় বলেন:

"তাদের নেক ভাগ্য দান করো, তাদের ধর্ম ও ঐশ্বর্য দাও,

নিজেই তাদের হেফাজত করো, তাদের ওপর তোমার রহমত বর্ষণ করো।

তাদের সৎপথ ও হেদায়াত দাও, দান করো দীর্ঘায়ু ও সম্মান,

এই দিনকে বরকতময় করো-পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাকে দেখেন।"

"শয়তান থেকে তাদের দূরে রেখো, তোমার সান্নিধ্যে রেখো,

তাদের প্রাণকে নূরে পরিপূর্ণ রেখো, হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে রেখো।

তাদের ওপর আমার জন্য অবশ্যই তোমার রহমত বর্ষণ করো,

এই দিনকে বরকতময় করো-পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাকে দেখেন।"

দোয়ার পাশাপাশি শিশুদের উত্তম বিষয়গুলোর উপদেশ ও নসিহত করা এবং এর সঙ্গে নিজেদের বাস্তব আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরাও অত্যন্ত জরুরি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

'*আকরিমু আওলাদাকুম*'

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মান করো।"

এখানেও একই দর্শন বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের সন্তানদের সম্মান করতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ গড়ে ওঠে। আমরা যখন সন্তানদের সম্মান করে ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সৎকাজে উৎসাহিত করব, তখন তারাও আমাদের নিজেদের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করবে এবং পিতা-মাতার আনুগত্য করবে।

হযরত উম্মুল মুমিনীন (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) যেভাবে তাঁর সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

"শিশুর প্রতি সর্বদা আস্থা প্রকাশ করা এবং দৃঢ় আস্থা প্রদর্শনের মাধ্যমে তার মধ্যে এমন লজ্জাবোধ ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা, যাতে সে পিতা-মাতার বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে-এটাই ছিল আপনার প্রশিক্ষণের একটি প্রধান নীতি। অতএব, শিশুর প্রতি আস্থা রাখবে এবং তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে না। মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা ছিল আপনার প্রথম শিক্ষা। আমাদেরও আপনি সর্বদা বলতেন, শিশুর মধ্যে এমন অভ্যাস গড়ে তোলো, যাতে সে কথা মেনে চলে। এরপর শৈশবের দুষ্টুমি করলেও ভয়ের কোনো কারণ নেই। যখনই তাকে নিষেধ করা হবে, সে বিরত হয়ে যাবে এবং তার সংশোধন হয়ে যাবে। আপনি বলতেন, একবার যদি কথা মানার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারো, তাহলে পরবর্তী সময়েও তার সংশোধনের আশা করা যায়। আপনি আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন। আমাদের কল্পনাতেও কখনো আসতে পারত না যে, পিতা-মাতা অনুপস্থিত থাকলেও আমরা তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে পারি।"

হযরত উম্মুল মুমিনীন (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) সর্বদা বলতেন, আমার সন্তানরা মিথ্যা বলে না। আর তাঁর এই আস্থাই আমাদের মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখত; বরং মিথ্যার প্রতি আমাদের আরও বেশি ঘৃণা সৃষ্টি করত।

আমাদের নেতা হযরত মুসলে মওউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জামাতের নারীদের ও কন্যাশিশুদের প্রশিক্ষণ নিয়ে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, এ বিষয়ে তিনি নারীদের উদ্দেশে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন, যা আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা। সেগুলো বারবার পড়া এবং সেগুলোর ওপর আমল করা আমাদের কর্তব্য। তিনি বলেন:

"জাতির মধ্যে জান্নাত কেবল মায়েদের মাধ্যমেই আসে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বলেছেন, মায়ের পদতলে জান্নাত। এটি কতই না সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি বাক্য! মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মায়ের কতখানি গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন! সাধারণত মানুষ এর অর্থ করে যে, মায়ের আনুগত্য ও বাধ্যতা পালনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। এটিও সঠিক। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, বাস্তবিকপক্ষে কোনো জাতির মধ্যে তখনই জান্নাত আসে, যখন মায়েরা উত্তম হন এবং সন্তানদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেন। মায়েরা উত্তম না হলে সন্তানরাও কখনো উত্তম হবে না। আর যে জাতির সন্তানরা উত্তম হবে না, সেই জাতির মধ্যে জান্নাতও আসবে না।"

হুযূর আনওয়ার (আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীয) বলেন:

"সর্বদা সন্তানদের প্রতি যত্নশীল থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তাদের পথনির্দেশনা দিতে হবে। নারীদের নিজেদের ঘরে সময় কাটানো উচিত। বাধ্যবাধকতা ছাড়া, যতদিন সন্তানদের প্রশিক্ষণের বয়স থাকে, ততদিন চাকরি করার প্রয়োজন নেই। চাকরি করতে হলে পরবর্তী সময়ে করা যেতে পারে। এমন কিছু মা রয়েছেন, যাঁরা সন্তানদের জন্য আত্মত্যাগ করেন। অথচ তাঁরা পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত, চিকিৎসক এবং উচ্চশিক্ষিত; কিন্তু সন্তানদের জন্য তাঁরা ঘরে থাকেন। যখন সন্তানরা এমন বয়সে পৌঁছে যায়, যে বয়সে তাদের মায়ের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন থাকে না এবং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন তাঁরা আবার কাজও করেন। অতএব, এ ক্ষেত্রে নারীদের আত্মত্যাগ করা উচিত। আল্লাহতালা নারীকে যে মর্যাদা দান করেছেন-যে তার পদতলে জান্নাত-তার কারণ হলো, সে আত্মত্যাগ করে। নারীর মধ্যে আত্মত্যাগের প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। যেসব নারী নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন, তাঁদের পদতলেই জান্নাত রয়েছে।"

- আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ মে ২০১৫।

হযরত আমিরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মসীহ আল-খামিস (আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীয) ২০০৪ সালে নাইজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জলসা সালানার ভাষণে আহমদী নারীদের উদ্দেশে বলেন:

"নারীরা স্মরণ রাখবেন যে, ইসলামী সমাজে তাঁদের একটি উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। তাঁরা যদি নিজেদের এই উচ্চ মর্যাদা উপলব্ধি না করেন, তাহলে এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না যে, তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। নারীরা সমাজে নিজেদের যে মর্যাদা রয়েছে, তা উপলব্ধি করুন। অন্যথায়, তাঁদের স্বামী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি অবাধ্য এবং তাদের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে। আর সর্বোপরি, তাঁরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করবেন। অতএব, প্রত্যেক আহমদী নারীর জন্য নিজের সংশোধনের প্রতি মনোযোগী থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সর্বদা এই দোয়া করতে হবে যে, আল্লাহতালা যেন তাঁকে পথনির্দেশনা দেন এবং এমন যোগ্যতা দান করেন, যাতে তিনি ইসলামী শিক্ষার আলোকে নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে লালন-পালন করতে পারেন।"

সন্তানদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে একজন মায়ের দায়িত্বের যে কয়েকটি দিক আমার বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো এখন উপস্থাপন করছি।

আল্লাহতালার প্রতি ভালোবাসা

সন্তানদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো, তাদের হৃদয়ে আল্লাহতালার প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলা। সুতরাং, একজন মায়ের জন্য আবশ্যক যে, তিনি নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে আল্লাহতালার সামনে অবনত হবেন এবং এমনভাবে সন্তানদের প্রশিক্ষণ দেবেন, যাতে শিশুর হৃদয়ে একেবারে শৈশব থেকেই আল্লাহতালার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শিশুদের সর্বপ্রথম যে কথা শেখাতে হবে, তা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। শিশুর কানে সর্বপ্রথম যে শিক্ষা পৌঁছাবে, তা যেন হয় আল্লাহর মহত্ত্ব ও মহিমার শিক্ষা। নবজাতক শিশুর প্রশিক্ষণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রথম শিশুর কানে আজান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

শিশুরা যত বড় হতে থাকবে, মায়েদের কর্তব্য হবে, সময় ও পরিস্থিতির দাবি অনুসারে তাদের আল্লাহতালার নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শেখানো। এভাবে সন্তানদের হৃদয়ে আল্লাহতালার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, খাবার খাওয়ার সময় তাদের বোঝাতে হবে যে, এই খাদ্য আল্লাহতালা আমাদের দান করেছেন। কত পরিশ্রমের পর তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে! এ জন্য আমাদের আল্লাহতালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-খামিস (আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা) বলেন:

"শৈশব থেকেই হৃদয়ে আল্লাহতালার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। হযরত মসীহে মওউদ (আলাইহিস সালাম) যেমন বলেছেন, তাদের 'আবদুর রহমান'-অর্থাৎ পরম করুণাময়ের বান্দা-হিসেবে গড়ে তুলুন। শৈশব থেকেই হৃদয়ে আল্লাহতালার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। শিশুরা যখন একটু একটু করে কথা বুঝতে শিখবে, তখনই তাদের কোনো কিছু দেওয়ার সময় বলবেন, 'এটি তোমাকে আল্লাহ মিয়াঁ দিয়েছেন।' তাদের কৃতজ্ঞ হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এরপর ধীরে ধীরে বোঝান, যা কিছু চাইতে হবে, আল্লাহ মিয়াঁর কাছেই চাইবে।"

- যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার ভাষণ, ২০০৩।

একজন মায়ের দায়িত্বের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, সন্তানদের হৃদয়ে নামাজ আদায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা।

আমার প্রিয় বোনেরা! এটি একটি বাস্তব সত্য যে, প্রশিক্ষণ শুরু হয় নিজের কাজ ও আচরণের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন ফরজ দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করব এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকব, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সন্তানরাও অনুরূপ আচরণ করবে। আমরা যখন নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাব, তখন আমাদের সন্তানরাও দৌড়ে আমাদের সঙ্গে যাবে। মা যখন ঘরে নামাজ পড়বেন, তখন ছোট শিশুরা তাঁকে অনুকরণ করে সিজদা করবে। কিন্তু আমরা নিজেরা যদি নামাজের প্রতি নিয়মিত না হই, অথচ সন্তানদের নামাজের উপদেশ দিই এবং আশা করি যে তারা নামাজি হয়ে উঠবে, তাহলে তা হবে নিছক অলীক কল্পনা।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আর-রাবে (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) বলেছেন:

"নামাজ তো মানবজীবনের প্রাণ। নামাজ না থাকলে আল্লাহর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং, এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও শৈশব থেকেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। হঠাৎ করে শিশুদের মধ্যে এই অভ্যাস সৃষ্টি হয় না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন, তা হলো- সাত বছর বয়স থেকে তাদের সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়া শুরু করো এবং তা ভালোবাসার সঙ্গে করো। কঠোরতা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মারধর করারও কোনো প্রয়োজন নেই। এরপর সেই শিশু যদি দশ বছর বয়স পর্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে শিখতে থাকে, তাহলে দশ থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে তার প্রতি কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করো। কেননা, এই বয়সে শিশুরা খেলাধুলার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকে। তাই তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কখনো সামান্য শাস্তি দেওয়া বা কিছু কঠোর কথা বলা প্রয়োজন হয়ে থাকে।"- জুমার খুতবা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০০।

হযরত উম্মুল মুমিনীন নুসরাত জাহান বেগম সাহেবা নামাজের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি প্রতিদিন শুধু নামাজ আদায়ই করতেন না, বরং যথাসময়ে নামাজ আদায়ের প্রতিও কঠোরভাবে যত্নবান ছিলেন এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, নামাজের সময় হলে তিনি অজু করে আজানের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। আজান হয়ে গেলে আশপাশের শিশুদের বলতেন, "আমি নামাজ পড়তে যাচ্ছি। মেয়েরা, তোমরাও নামাজ পড়ো।"

এভাবে তিনি নিজের বাস্তব আদর্শের মাধ্যমে উপদেশ দিতেন। সুতরাং, দেখুন, উপদেশ দেওয়ার এটিই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি।

পিতা-মাতার কর্তব্য হলো, শৈশবেই সন্তানদের নামাজের অনুবাদও শেখানো। হযরত খলিফাতুল মসীহ আর-রাবে (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) বলেন:

"ইবাদতের সম্পর্ক ভালোবাসার সঙ্গে। কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজের অনুবাদ শেখানোর ফলে কারও মধ্যে ইবাদতের অভ্যাস গড়ে উঠবে- এমনটি নয়। যেসব পিতা-মাতার হৃদয়ে ইবাদতের অনুভূতি রয়েছে, যাঁরা নামাজকে ভালোবাসেন, তাঁরা যখন সন্তানের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে তাকে নামাজের অনুবাদ শেখান, তখন বিষয়টি ভিন্ন রূপ ধারণ করে। শিশু তার পিতা-মাতার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাঁদের হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করে এবং তাঁদের আবেগ-অনুভূতি তার নিজের মধ্যেও এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁরা যখন শিশুকে নামাজ শেখান, তখন তাঁদের শেখানোর ধরনও ভিন্ন হয়।

প্রত্যেক আহমদীকে নামাজের বিষয়ে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। এর সঙ্গে নিজের সত্তাকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে এর মধ্যে নিয়োজিত করতে হবে। তখনই এমন প্রজন্ম গড়ে উঠবে, যারা আল্লাহতালার দৃষ্টিতে নামাজি প্রজন্ম হিসেবে বিবেচিত হবে।" - জুমার খুতবা, ৮ নভেম্বর ১৯৮৫। (চলবে..)

মহান আল্লাহর বাণী

নিশ্চয়আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Humayum Kabir, Nalhati,(Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 5 Nov, 2026 Issue No.45

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

৯ পাতার পর.....

সাহেবকে এই ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানালেন না।

হুজুর যখন গুরুদাসপুরের বাড়িতে পৌঁছালেন, তখন তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী একটি পৃথক ঘরে খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আমাদের সবার শরীর ভয়ে শিউরে উঠছিল–এখন কী হবে!

কিছুক্ষণ পর হুজুর আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন হজরত সাহেব দুই হাতের তালু একত্র করে মাথার নিচে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন। আমি যাওয়ার পর তিনি এক পাশে কাত হয়ে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নিজের হাতের তালুর সাহায্যে মাথা ঠেকিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং আমাকে বললেন, "আমি আপনাকে ডেকেছি, যাতে পুরো ঘটনাটি শুনতে পারি। কী ঘটেছে, বলুন।"

তখন ঘরে আর কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। শুধু দরজার কাছে মিয়াঁ শাদি খান দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমি তাঁকে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করলাম–কীভাবে সেখানে পৌঁছে আমরা ডা. ইসমাইল খান সাহেবকে কাঁদতে দেখেছিলাম, কীভাবে ডাক্তার সাহেব মুহাম্মদ হুসাইন মুন্সির আগমনের ঘটনা জানিয়েছিলেন এবং মুহাম্মদ হুসাইন তাঁকে কী কী কথা বলেছিলেন।

হুজুর নীরবে সব শুনতে থাকলেন। আমি যখন 'শিকার' শব্দটির কথা বললাম, তখন হজরত সাহেব হঠাৎ উঠে বসে পড়লেন। তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমি তার শিকার! আমি শিকার নই, আমি সিংহ–আর সিংহও আল্লাহর সিংহ! সে কি আল্লাহর সিংহের ওপর হাত দিতে পারে? সে এমন করে দেখুক না!

এই কথাগুলো বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর এত উচ্চ হয়ে উঠেছিল যে, ঘরের বাইরেও সবাই চমকে উঠলেন এবং বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু ঘরের ভেতরে কেউ প্রবেশ করলেন না।

হুজুর কয়েকবার 'আল্লাহর সিংহ' কথাটি পুনরাবৃত্তি করলেন। সে সময় তাঁর চোখ, যা সাধারণত নিচু ও অর্ধনিমীলিত থাকত, সত্যিই সিংহের চোখের মতো সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে অগ্নিশিখার মতো জ্বলজ্বল করছিল। তাঁর মুখমণ্ডল এতটাই লাল হয়ে উঠেছিল যে, সেদিকে তাকানো যাচ্ছিল না।

এরপর তিনি বললেন, "আমি আর কী করতে পারি! আমি তো আল্লাহর সামনে এই নিবেদন করেছি যে, তাঁর ধর্মের জন্য আমি নিজের হাত–পায়ে লোহার বেড়ি পরতেও প্রস্তুত। কিন্তু তিনি বলছেন, 'না, আমি তোমাকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করব এবং সসম্মানে মুক্ত করব।'

এরপর তিনি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরে তিনি গভীর আবেগ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন।

কিন্তু হঠাৎ কথা বলতে বলতেই তাঁর বমি বমি ভাব হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে গেল। বমিটি ছিল সম্পূর্ণ রক্তের–তার মধ্যে কিছু রক্ত জমাট বাঁধা ছিল এবং কিছু ছিল তরল।

হজরত সাহেব বমি করার পর মাথা তুলে রুমাল দিয়ে নিজের মুখ মুছলেন। চোখও মুছলেন, কারণ বমির কারণে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু বমির সঙ্গে কী বেরিয়েছে, তা তিনি বুঝতে পারেননি। কারণ, তিনি হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে বমি করেছিলেন এবং তারপরই মাথা তুলে নিয়েছিলেন।

আমি যখন তা দেখার জন্য ঝুঁকলাম, তখন হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে?

আমি নিবেদন করলাম, "হুজুর, বমির সঙ্গে রক্ত বেরিয়েছে।"

তখন তিনি সেদিকে তাকালেন।

এরপর খাজা সাহেব, মাওলভি মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং অন্যান্য সবাই ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। একজন চিকিৎসককে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ চিকিৎসক। তিনি এসে বমিটি পরীক্ষা করলেন এবং খাজা সাহেবের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কথার অর্থ ছিল, এই বার্ধক্যে এভাবে রক্তবমি হওয়া বিপজ্জনক।

এরপর তিনি বললেন, "তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন না কেন?

খাজা সাহেব বললেন, "বিশ্রাম নেবেন কীভাবে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘন ঘন শুনানির তারিখ দিয়ে তাঁকে হয়রান করছেন, অথচ এটি একটি সাধারণ মামলা, যা সহজেই নিষ্পত্তি করা সম্ভব।"

চিকিৎসক বললেন, "এই মুহূর্তে বিশ্রাম নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমি একটি চিকিৎসা–সনদ লিখে দিচ্ছি। কত দিনের জন্য সনদ প্রয়োজন?

এরপর তিনি নিজেই বললেন, "আমার মতে, তাঁর দুই মাস বিশ্রাম নেওয়া উচিত।"

খাজা সাহেব বললেন, "আপাতত এক মাসই যথেষ্ট হবে।"

চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গেই এক মাসের জন্য একটি চিকিৎসা–সনদ লিখে দিলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করলেন যে, এই সময়ের মধ্যে তিনি হজরত সাহেবকে আদালতে হাজির হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করেন না।

এরপর হজরত সাহেব ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলাম, এখন আবার নতুন কোনো মামলা শুরু হয়ে যায় কি না। কারণ, পরদিনই শুনানির তারিখ ছিল এবং হুজুর গুরুদাসপুরে এসে আদালতের অনুমতি ছাড়াই ফিরে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু হজরত সাহেবের মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততার ভাব ছিল। সুতরাং, আমরা সবাই কাদিয়ানে ফিরে এলাম।

পরবর্তীকালে আমরা শুনলাম, ম্যাজিস্ট্রেট চিকিৎসা–সনদটি নিয়ে ব্যাপক জেরা করেছিলেন, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং চিকিৎসককে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে ডেকেছিলেন। কিন্তু সেই ইংরেজ চিকিৎসক বলেছিলেন, "আমার চিকিৎসা–সনদ সম্পূর্ণ সঠিক। আমি আমার চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। আমার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে এই সনদের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। আমার চিকিৎসা–সনদ সর্বোচ্চ আদালতগুলোতেও গ্রহণযোগ্য।"

ম্যাজিস্ট্রেট বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর কোনো প্রচেষ্টাই সফল হলো না।

এরপর সেই সময়ের মধ্যেই তাঁকে গুরুদাসপুর থেকে অন্যত্র বদলি করা হয়। শুধু তা–ই নয়, কোনো আপাতদৃষ্টিতে অজ্ঞাত কারণে তাঁর পদমর্যাদার অবনমন করা হয়; অর্থাৎ তাঁকে অতিরিক্ত সহকারী কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে মুনসিফ করা হয়।

এই অধম নিবেদন করছে যে, সম্ভবত সেই ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ছিল চন্দুলাল এবং যে তারিখে হজরত সাহেবের এই মামলায় আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল, সম্ভবত সেটি ছিল ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ।

২ পাতার পর .....

তাঁর পিতা, অর্থাৎ আমার পিতামহ, হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)–এর পিতা হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)–এর তুলনায় মর্যাদায় নিম্নস্তরের ছিলেন। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সময়ে খিলাফতের অধিকতর যোগ্য অধিকারী ছিলেন। আর তাঁর পর আমার পিতামহ ও পিতার তুলনায় হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) খিলাফতের অধিকতর যোগ্য অধিকারী ছিলেন। অতএব, আমি এই নেতৃত্বের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করছি।'

– খিলাফতে রাশেদা, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৫৫৭–৫৮৮।

একবার একজন শিয়া বন্ধু হযরত খলিফাতুল মসীহ আস–সানি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁকে সম্বোধন করে হুযূর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"আপনি শিয়া মতাবলম্বী। আপনি দেখুন, হযরত ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)–এর সঙ্গে যা করা হয়েছিল, আল্লাহতালা তার কীভাবে প্রতিদান দিয়েছেন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তার পুত্রকে রাজা করা হয়েছিল। সে প্রথমেই যে কাজটি করেছিল, তা হলো, লোকদের একত্র করে বলেছিল, 'হে লোকেরা! তোমরা আমাকে রাজা বানিয়েছ বটে, কিন্তু আমি এই পদের যোগ্য নই। এখানে এমন লোকেরা উপস্থিত আছেন, যাঁরা আমার চেয়ে অধিক যোগ্য। তোমরা তাঁদের রাজা বানিয়ে নাও। আর যদি তাঁদের রাজা না বানাও, তাহলে এই খিলাফতের পদ তো রয়েছেই।' লোকেরা তাকে অনেক জোরাজুরি করেছিল, কিন্তু ইয়াজিদের পুত্র, যে অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি ছিল, বলেছিল, 'আমি এই পদের যোগ্য নই।' সে যখন বাড়িতে ফিরে এল, তখন পরিবারের লোকেরা বলল, 'তুমি তো আমাদের বংশের নাক কেটে দিয়েছ!' সে বলল, 'আমি বংশের নাক কাটিনি, বরং নাক লাগিয়ে দিয়েছি।' এভাবেই আল্লাহতালা হযরত ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)–এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।"

– দৈনিক আল–ফজল, রাবওয়া, ৫ জুলাই ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৩।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir